হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

অলোক রায়
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২



আমাদের ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠ্যবইতে থাকত হেমচন্দ্রের কবিতা, মুখস্ত করতে হয়েছে পদ্মের মৃণাল (পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে/দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে), পরশমণি (কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন!), জীবন-সঙ্গীত (ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে,/এ জীবন নিশার স্বপন), অথবা জীবন মরীচিকা-র (জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে) মতো কবিতা। ভালো লাগবার কথা নয়— পঞ্চাশ বছর আগেই আমাদের কাব্যরুচির পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে বৃত্রসংহার কাব্যের সঙ্গে পরিচয় হল। এ-কালের পাঠককে বৃত্রসংহার আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু সেই সময়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি, বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের কবিতায় কী পেয়েছিলেন—যে জন্য তিনি বলতে পারেন, 'মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গকবি সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্ত ধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।' (১৮৭৩) তারপর বেশ কয়েকবছর কেটেছে—ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১৮৭৭) ছয় সংখ্যা ধরে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের 'একটি তীব্র সমালোচনা' লেখেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, ভারতী পত্রিকার ১২৮৯ সালে শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন মেঘনাদবধ কাব্য নিয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ (১৮৮২)—যেটি স্থান পেয়েছে সমালোচনা গ্রন্থে (১৮৮৮)। রবীন্দ্রনাথ তখন আর নিতান্ত ছেলেমানুষ নন, অথচ তিনি আশ্চর্য এক মন্তব্য করেন, 'হেমবাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর-কিছু বলিতে পারি না।' এর পর রয়েছে আমার নিজের গৃহে, মাতামহ মন্মথনাথ ঘোষের লেখা তিন খণ্ডে হেমচন্দ্রের জীবনী—যার প্রতিপাদ্য মধুসূদনের থেকে তিনি অনেক বড় কবি। এই অন্যায় তুলনা, ভ্রান্ত বিচারবোধ, মধ্যবিত্ত কাব্যসংস্কার—এর প্রতিক্রিয়ায় মোহিতলাল মজুমদার থেকে প্রমথনাথ বিশী এক-কথায় 'কবি' হিসেবে হেমচন্দ্রকে খারিজ করে দিলেন। একালে লেখা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে সাহিত্য সমালোচনা-নিবন্ধে দেখানো হয়েছে, হেমচন্দ্র মধুসূদনের নকলনবিশমাত্র—কিন্তু তা কেবল অক্ষম কবির বামন হয়ে চাঁদ ধরার ব্যর্থ প্রয়াস।

অথচ হেমচন্দ্র যখন চিন্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১) লেখেন, তখন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। চিন্তাতরঙ্গিণী বা বীরবাহু কাব্যে মধুসূদনের

কোনো পরোক্ষ প্রভাবও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই সময় থেকেই হেমচন্দ্রের মনে কবিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কতকগুলি ধারণা দেখা যায়, এবং তাঁর সমগ্র জীবনে কাব্য সম্বন্ধে সেই মৌলিক ধারণার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মধুসূদনের কাব্যের সঙ্গে বৃত্রসংহার কাব্যের যেটুকু সাদৃশ্য চোখে পড়ে, তা অনেকটা যুগগত ও শিক্ষাগত কারণে অনিবার্য ছিল। হেমচন্দ্রও হিন্দু-কলেজের ছাত্র, ইংরেজি সাহিত্যে সুঅধীতী। শেক্‌সপিয়র, মিলটন, পোপ, গ্রে, কুপার, স্কট, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, বায়রন এবং টেনিসন প্রভৃতি কবিদের রচনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। বৃত্রসংহার কাব্যের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'শিক্ষাভেদ অনুসারে গ্রন্থকারের রুচি ও রচনার প্রভেদ হইয়া থাকে। বাল্যাবধি আমি ইংরেজি-ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থলে যে ইংরেজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।' মধুসূদনের মৃত্যুর পর বৃত্রসংহার কাব্য প্রথম খণ্ড (১৮৭৫) প্রকাশিত হয়—ততদিনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙালি পাঠক কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছে সত্য। কিন্তু তিনি বৃত্রসংহার-এর ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই।' এ কথা শুধু ছন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, হেমচন্দ্রের সমগ্র কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে কমবেশি পরিমাণে প্রযোজ্য।

হেমচন্দ্রের কবিতা আধুনিক পাঠকের ভালো লাগে না, তার একাধিক সংগত কারণ আছে। কিন্তু হেমচন্দ্র যে 'কবি' ছিলেন, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। এ কালে আমরা হেমচন্দ্রের কবি-ভাষা ও কাব্য-ছন্দ পছন্দ করি না—কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কবিতার 'ছন্দাছন্দের বিচার' বা ভাষাব কাব্যমূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়, উচিতও নয়। হেমচন্দ্র কবিতার স্বরূপ আলোচনাকালে অদ্ব্যর্থভাযায় জানিয়েছেন, 'কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ্য-রচনা হউক, কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার-স্বরূপ, কাবণ গদ্য-বচনার স্থানে-স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতারসাস্বাদনের সম্যক্ সুখ অনুভূত হয়।' আসলে নানা 'ভাবের উদ্রেক ও উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিংবা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকেই কাব্য কহে এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের এত চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়।' এই কারণে হেমচন্দ্র মধুসূদনের কুহকিনী সৃজনী-শক্তির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত এবং 'লেখার চমৎকারিত্ব' অপেক্ষা 'ভাবের চমৎকারিত্ব'কে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। হেমচন্দ্রের মতে : 'পরিপাটি সর্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা' ভারতচন্দ্রের ছিল, কিন্তু 'গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল।' সেই গুণগুলি কী?—না, 'যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ

ভাব.....' কিংবা 'কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ...., বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাচ্ছটা।' এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, হেমচন্দ্র কবিতা কাকে বলে তা জানতেন এবং নিজে শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনায় সক্ষম হোন বা না-হোন, তাঁর কাব্যাদর্শ বহির্মুখী নয়, অন্তর্মুখী।

এই কথাটা বিশেষভাবে বোঝা দরকার। চিন্তাতরঙ্গিণী যদিও তাঁর অপরিণত বয়সের রচনা, কিন্তু কাব্যের নাম থেকেই বোঝা যায়, তাঁর রচনা আত্মগত ভাবনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ। অনেকে বায়রণের *Manfred* কাব্যের সঙ্গে চিন্তাতরঙ্গিণীর তুলনা করেছেন—বলাবাহুল্য এ তুলনা অনেকটা বহিরঙ্গ, কিন্তু হেমচন্দ্রের রোমান্টিক বিষাদমগ্নতার দিকটি এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিন্তাতরঙ্গিণীর মধ্যে একটা ক্ষীণ কাহিনী-ধারা আছে ; হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাব্যেও অনেক সময়ে গল্পাভাসের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু বৃত্রসংহার কাব্য-বাদে অন্যত্র, এমনকি বীরবাহু-কাব্যেও কাহিনীসূত্রটি অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ, প্রায় অবান্তর। আসলে অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য কবি একটা অবলম্বন গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আখ্যান-কাব্য রচনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এইখানে রঙ্গলালের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। অন্যদিকে ভাবকল্পনার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের রচনায় সংহতি ও সংগতির অভাব নেই। শুধু তরুণ বয়সে লেখা চিন্তাতরঙ্গিণী নয়, পরিণত বয়সে লেখা তাঁর গীতিকবিতাগুলির মধ্যেও একই চিন্তাস্রোত, বিষন্নতা, চিরন্তন-অতৃপ্তির প্রকাশ ঘটেছে। মনে পড়বে চিন্তা নামে তাঁর বিখ্যাত কবিতাটির কথা, যেখানে তিনি বলেন,

শুধু কি আমারি চিত্তে এরূপে খেলাও
কিম্বা সকলেরই মন এমনই দুলাও
বাঁধি সূক্ষ্মতম ডোরে—হাসাও কাঁদাও
বল লীলাময়ী চিন্তে, সবারি কি মন বৃন্তে
এমনি ভাবনা-ফুল নিয়ত ফুটাও।

কবির মনোবৃন্তে যে ভাবনার ফুল ফুটে ওঠে, হেমচন্দ্র তাকেই কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন আশাকানন, ছায়াময়ী বা দশমহাবিদ্যা কাব্যে। এখানে লক্ষণীয়, তিনটি কাব্যই রূপকধর্মী রচনা। আশাকানন কবির ভাষায় 'সাঙ্গরূপক কাব্য'—'মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য।....প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাহার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা, ইহার অভিপ্রেত।' কাব্যরূপের দিক থেকে এখানে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটে, আর ভাবোপলব্ধির দিক থেকে এখানে জীবনজিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটে। কাব্যের নাম আশাকানন হলেও কাব্যটি শেষ হয়েছে 'নৈরাশক্ষেত্রে...হতাশের মূর্তি দর্শনে'—'আশার কাননে পরিণাম এই নিরূপিত বিধাতার।' ছায়াময়ী দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়ার আভাস মাত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচিত—দান্তের কাব্যের ভাব ও রচনাপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করা হলেও একে অনুবাদগ্রন্থ মনে করার কোনো কারণ নেই। রূপক-কাব্য

হিসেবে ডিভাইনা কমেডিয়া হেমচন্দ্রকে আকর্ষণ করেছে। দশমহাবিদ্যাকে কবি 'গীতিকাব্য' নামে অভিহিত করেছিলেন—এখানে পুরাণের বিবরণ তাঁর অবলম্বন হলেও ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, 'বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।' কবিতা রচনার প্রয়োজনেই এখানে কবির জীবনজিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটেছে, নারদের মুখে কবি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন :

মানব কিরূপ ধন জড়েই কি বিশেষণ,
জড় সনে সঞ্চারে কিবা বিধি মননে?
সুখ কি জীবিতমানে? কিবা অর্থ নির্বাণে?
কা হতে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমিল বিধাতার
মানস হতে কি এ মলিনতা রচনা?

এদিক থেকে দশমহাবিদ্যাকেও রূপক-কাব্য বললে অন্যায় হয় না। কিন্তু, হেমচন্দ্রের এই রূপক রচনার প্রবণতার পিছনে যে কাব্যপ্রেরণা কাজ করেছে, আমাদের তা খুঁজে বার করতে হবে।

আবার বলি, হেমচন্দ্রকে রঙ্গলাল-মধুসূদন ধারার আখ্যান-কাব্য বা মহাকাব্য-রচয়িতা হিসেবে গ্রহণ করার ফলে আমরা তাঁর যথার্থ কবিপরিচয় লাভ করতে পারিনি। হেমচন্দ্র কাহিনী-রচনায় বা চরিত্র-পরিকল্পনায় ব্যর্থ হতে পারেন—কারণ তা তাঁর স্বক্ষেত্র ছিল না। তিনি যে আসলে জীবনের রহস্যাবিষ্কারে ব্রতী, এবং সেখানেও দর্শন-বিজ্ঞানের পরিবর্তে অন্তরাকৃতির উপর বেশি নির্ভর করেন, তিনি যে শেষ পর্যন্ত জীবনরহস্য আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়ে চরম হতাশা ও নৈরাশ্যে নিমগ্ন—তা আমাদের বোঝা দরকার। 'আমি হেরি যত চাহি যেবা পথ/হেরি ছায়াময় সব মনোরথ/যত আশাচ্যুত কিছু মনোমত/নহে ভূতলে।' উনিশ শতকের আদর্শবাদ ও হিন্দুধর্ম-বিশ্বাস তাঁর মনে কাজ করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত যেন কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পান না, কেবলি বলেন,

আমারি হৃদি কেবল মায়া শূন্য মরুল,
কোনো বাসনায় বদ্ধ নয়।
এত শোভা ধরণীতে কিছুই না ধরে চিতে
শূন্য প্রাণে দেখি সমুদায়।

অনেকের হয়তো শুনে খুব আশ্চর্য লাগবে যে, হেমচন্দ্র সে কালে মধুসূদনের অনুসরণ করেননি, অনেক ক্ষেত্রে তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সহযাত্রী ছিলেন। হেমচন্দ্র বিহারীলালের কাব্যের অনুরাগী ছিলেন তার প্রমাণ আছে : 'তিনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন, এবং তাঁহার যতগুলি কবিতা আমি পাঠ করিয়াছি, সকলগুলিই মধুরতাময় ও কবিত্বপূর্ণ।' ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিহারীলালের বন্ধু ছিলেন, 'অবোধবন্ধু'

পত্রিকায় ইন্দ্রের সুধাপান-প্রভৃতি কবিতা লেখেন। হেমচন্দ্র বিহারীলালের মতোই কল্পনালক্ষ্মীর আরাধনা করেছেন :

নবীন মেঘের মেলা, নবীন বিজলী-খেলা,
নব কলাধর-শশী-কিরণ প্রকাশ।
স্বর্গ শূন্য ধরা পর, কত হেন কল্পনার,
অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,
বিচারি, ব্রহ্মাণ্ডময়, হর্য-পুলকিত কায়,
হেরি কত অস্তোদয় হয় ধরণীতে।

হেমচন্দ্রের এই দীর্ঘ কবিতাটি (কল্পনা) সম্পূর্ণ পড়লে অনেকেই হয়তো হেমচন্দ্রের উপর বিহারীলালের প্রভাব নির্দেশ করবেন। আর এই প্রসঙ্গে হয়তো অনেকের মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার উপর হেমচন্দ্রের প্রভাবের কথা। কিন্তু এইভাবে প্রভাব-নির্দেশ নিরর্থক। সাদৃশ্য-সম্ভাবনার পিছনে যুগগত অভিঘাত কাজ করতে পারে, অন্য কারণ থাকাও সম্ভব। আপাতত হেমচন্দ্রের কাব্যাদর্শের স্বরূপ সন্ধান করতে হবে আমাদের। হেমচন্দ্র যে পোপ-ড্রাইডেন, গ্রে-কুপার, বায়রন-শেলি, টেনিসন-লঙ্‌ফেলোর কবিতার অনুবাদ করেন তা নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার নয়।

এখানে হেমচন্দ্রের তথাকথিত 'অনুবাদ' প্রসঙ্গটিও একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। অনুবাদ হিসেবে দেখলে হেমচন্দ্রের রচনা ব্যর্থ ও আপত্তিকর মনে হবে। কিন্তু হেমচন্দ্র কখনও আক্ষরিক অনুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না—শেক্‌সপিয়র-অনুবাদকালে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর ভাষান্তরের প্রয়াস 'অনুবাদ' নয়,—'ছায়ামাত্র'। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার প্রকৃতিগত এত প্রভেদ যে ইংরেজি নাটক ও কাব্যের কেবল অনুবাদ করলে তাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য কিছুই থাকে না। তাই হেমচন্দ্র বিদেশি কাব্যকে দেশীয় ছাঁচে ঢেলে স্বদেশি পাঠকের রুচিসংগত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস 'এইরূপ কোনও প্রণালী অবলম্বন না করিলে, কোন বিদেশীয় নাটক, বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থানলাভ করিতে পারিবে না....। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিদেশীয় নাটক কবিতাদির অবিকল অনুবাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ কিছুকাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরিহার্য বলিয়াই আমার ধারণা।' বলাবাহুল্য, হেমচন্দ্রের বক্তব্য আমরা গ্রহণ করি বা না-করি, তাঁর কবিতা আলোচনাকালে তাঁর রচনাদর্শের কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। হেমচন্দ্রের বিদেশি-ভাবাশ্রয়ী কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর কবিমানসের পরিচয় মেলে—একদিকে সৌন্দর্যাবিষ্ট কল্পনাপ্রিয় কবি-মন, অন্যদিকে জীবন-জিজ্ঞাসু বিষণ্ণ প্রৌঢ় কবিদৃষ্টি। হেমচন্দ্র যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কামিনী রায়ের আলো ও ছায়া গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেন (১৮৮৯), তখন বাংলা কাব্যে নতুন ধারা প্রতিষ্ঠা-লাভ করতে শুরু করেছে, এবং যদিও হেমচন্দ্র পুরনো যুগের কবি বলেই পরিচিত, কিন্তু তাঁর পক্ষপাত কোন্‌দিকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না—'কবিতাগুলি আজকালের "ছাঁচে" ঢালা। যাঁহারা

এ-ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক কতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না ; তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহারাও লেখকের অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এ পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা এবং সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি, পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি, আর, বলিতেই বা কি, স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।'

সাময়িক বিষয় নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন সত্য, ভাষা ও ছন্দের সাবলীলতা-স্বাচ্ছন্দ্য এবং রহস্যসৃষ্টির নৈপুণ্যের জন্য হয়তো সেগুলিই আমাদের কাছে আজও উপভোগ্য। কিন্তু সেখানে 'সাময়িক'-হেমচন্দ্রের পরিচয় আছে। 'কবি' হেমচন্দ্র সেখানে প্রচ্ছন্ন ; সেখানে তিনি বলেন, 'হায় কি হোল—কলম ছুঁতে হাসি এলো দুখে/ভেবেছিলুম মনের কথা লিখবো ছাতি ঠুকে!' কৌতুক ও কান্না তাই মিলে গেছে খণ্ড-কবিতাবলীতে :

গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও ;—
রহস্য, রোদন, কিংবা উৎসাহে ভাসাও।

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১ অলোক রায়

সূ চি প ত্র

চিন্তাতরঙ্গিণী
১৮৬১

শীতল বাতাস বয় জলের কল্লোল।
রাঙা রবি-ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল ॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখি করে গান।
লোহিত-বরণ ভানু অস্তাচলে যান ॥
বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা।
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা ॥
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন।
শীতল শরীর সেবি মলয়-পবন ॥
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা একদিন ॥
ললাটের আয়তন সুচারু বরণ।
লোচনের আভা তার মুখের কিরণ ॥
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
সুরপুরবাসী বলি মনে ভ্রম হয় ॥
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে।
পূর্ব-কথা আলোচনা করিছে কাতরে ॥
একদৃষ্টে একদিকে রহি কতক্ষণ।
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন ॥
"দেবের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার।
প্রতীকাব নাহি তার বুঝিলাম সার ॥
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হতেছে এত দহনে তাহার ॥
চারিদিকে এইসব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা ॥
এই যে অলক্তময় ভানুর মণ্ডল।
এইসব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল ॥
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকর-ছটা।
সোনার পাতায় যেন সিঁদুরের ঘটা ॥
এই শ্যাম দূর্বাদল এই নদী-জল।
মণ্ডিত লোহিত-রবি-কিরণে সকল ॥

নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায় ॥
মনের আনন্দে ওই পাখি করে গান।
জানায় জগৎ-জনে রবি অস্ত যান ॥
ঊর্ধ্বপুচ্ছ গাভী ওই গাইয়া গোধূলি।
যাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি ॥
কৃষক, রাখাল আর গৃহী যতজন।
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত মন ॥
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল ॥
ত্যজি গৃহকারাগার এনু নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে ॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের জ্বালা নিবারিবে তায় ॥
চিন্তা-বিষে মন যার জরে একবার।
নিরুপায় সেইজন বুঝিলাম সার ॥
এ ছার”—এমন কালে, প্রিয়সখা তার।
আসি, পাশে দাঁড়াইয়া করে নমস্কার ॥
“একাকী এখনো হেথা কীসের কারণ?”
বলিয়া সুধায় তায়, সেই বন্ধুজন ॥
“এসো-এসো-এসো ভাই প্রাণের কমল।
দেখো বুকে হাত দিয়ে হল কী শীতল ॥
ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার ॥
সাধুপুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরক-কুণ্ড কূপের সমান ॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা-অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার ॥
দম্ভ, অহংকার, মিথ্যা, চুরি পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার ॥
নরহত্যা, অনিবার্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত ॥
পরিপ্লুত বসুন্ধরা, এইসব পাপে।
স্মরণ করিতে দেহ থরথর কাঁপে ॥
প্রতীকার কীসে তার বলো দেখি ভাই।
এই দেখো নদীজলে ঝাঁপ দিতে যাই ॥”

এই কথা বলি তারে আলিঙ্গন করি।
যেতে চায় নরসখা, সখা রাখে ধরি ॥

"কেমন আছ হে আজি? নিরুত্তর কেন?
অতিশয় ম্লান ভাব দেখি কেন হেন?"
"আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল।
কী হবে থাকিয়ে হেথা প্রাণের কমল ॥
দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু।
জন্মদাতার ধার শোধিতে নারিনু ॥
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু।
দিন-দিন মহাপাপে ডুবিতে লাগিনু ॥
মনের বাসনা কই পূরাতে পারিনু।
মানব-মণ্ডলী কই পবিত্র করিনু ॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেঁচিলাম কই।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা নাশিলাম কই ॥
কই আপনার মন নিরমল হল।
কই ধর্ম-পথে মন স্থির হয় বলো ॥
হায় এ-বয়সে কত পাপ করিলাম।
কত ছলিলাম কত মিথ্যা বলিলাম।
তাহে দিন-দিন ক্ষীণ হয় বুদ্ধি বল।
পৃথিবীর ভার দিন বাড়াই কেবল ॥
পিতৃ-গলগণ্ড হয়ে কতকাল রব?
অনুতাপ-শিক্ষা আর কতকাল সব ॥
আহা কী সুখেতে কাল শিশুরা কাটায়।
ওই দেখো নাচি-নাচি কয়জনা ধায় ॥
মনের সাধেতে খেলা করো এইবেলা।
এখনি হইবে সন্ধ্যা ভাসাইবে ভেলা ॥
দিনকত থাক আর জানিবে তখন।
আনন্দের ধাম এই পৃথিবী কেমন ॥
ওই বেলা কত খেলা আমিও খেলেছি।
ওই খেলা কত আশা আমিও করেছি ॥
এখন বুঝেছি সার অসার সংসার।
দণ্ড দুই আলো পরে ঘোর অন্ধকার ॥
এ ভবের নাট্যশালা ছায়াবাজি প্রায়।
দিন-দুই ধুমধাম পরেতে ফুরায় ॥
মধুময় শিশুকাল কতদিন রয়।

যৌবন-সৌরভ দিন-চারি বই নয়!
বিষয়ী লোকের মান, আজি আর কালি!
প্রবল-পবনে যেন উড়ে মরুবালি ॥
বীরের বীরত্বগুণ প্রথম-প্রথম!
বিস্তারিত দশদিকে চাঁপাগন্ধ সম ॥
কিন্তু যেন মধ্যাহ্নের প্রখর মিহির!
বৈকালে লুকায় আড়ে মেঘ সুগভীর ॥
বিঘোর আঁধারময় এ ভব-ভিতরে।
সুখ যাহা দেখো তাহা মুহূর্তের তরে ॥
অমানিশা, তাহে মেঘ, কালিম বরণ।
তার মাঝে যেন সৌদামিনী দরশন ॥
আঁধার নিশাতে যেন তাহার পতন।
জলবিম্ব ক্ষণে যেন জলেতে মগন ॥
শরতের মেঘ যেন ঘনঘন ডাকে।
বৃথা আড়ম্বর উড়ে যায় ফাঁকে-ফাঁকে ॥
সাগর-চরেতে যেন বালির নির্মাণ।
একটি তরঙ্গ পরে না থাকে নিশান ॥"

হেরিয়া বসন্ত-শোভা বসুন্ধরা-মাঝে।
ঋতুমহোৎসবে সুখে রামাগণ সাজে ॥
রাজবালা বনমালা সখী কয়জন।
সবে কৈল সমরূপ বসন-ভূষণ ॥
তেয়াগি নেতের বাস রতনের দাম।
অরণ্য-কুসুমে বেশ কৈল অভিরাম ॥
নবীন বল্কল পরি লাজ সংবরিয়া।
ধরিল বিচিত্র বেশ কুসুম পরিয়া ॥
মুক্তামালা বিনিময়ে বনমালা-দলে।
সযতনে কণ্ঠহার পরিলেন গলে ॥
কর্ণবালা করবালা করি তিরোহিত।
শ্রুতিমূলে ঝুমকা-ফুল হৈল বিরাজিত ॥
কপালের সিঁতি-শোভা আভা লুকাইল।
কৃষ্ণচূড়া কেশমূলে আসি দেখা দিল ॥
নিতম্বে মেখলা ঘুচে লোহিত গোলাপ।
নাভিপদ্ম-সনে আসি করিল আলাপ ॥
চরণে নূপুরধ্বনি আর না বাজিল।
রক্তজবা অরুণের আভা প্রকাশিল ॥
এইরূপে বল্কবাস পুষ্প-আভরণ।
করে বীণা-বাঁশি আদি করিয়া ধারণ ॥
চলিল যথায় চূত কাতর-হৃদয়। .
মাধবী তুলিতে কোলে অধোমুখে রয় ॥
নিকটে আসিয়া বীণা-বাঁশি বাজাইয়া।
মাধবী-লতায় চুয়া-চন্দন ঢালিয়া ॥
মুকুলিত চুয়াঁশাখা নোয়াইয়া করে।
চূত-মাধবিতে বিয়া দিল সমাদরে ॥
এইরূপে কত খেলা খেলিতে লাগিল।
পশু-পক্ষী আদি সবে হরিষে ভাসিল ॥
হীনবল প্রভাকর প্রদোষ হইল।
বিপিন ভ্রমিয়া নৃপতনয় ফিরিল ॥
তৃণাসনে কয়জনে বসিয়া তখন।
ভোজন করিয়া ক্ষুধা করি নিবারণ ॥
পুনরায় বনলীলা আরম্ভ করিল।
রাজপুত্র এইবার সংহতি চলিল ॥
হ্রদতটে নারীগণ আসিয়া তখন।

বলে "চলো বারি পরে করি গে ভ্রমণ ॥"
বলি পদ্মফুলে গাঁথা ভেলার উপরে।
রাজবালা-বনবালা উঠে পরে-পরে ॥
ধারে ধারে সারি সারি বসিল কজন।
অবশেষে বীরবাহু কৈল আরোহণ ॥
কাণ্ডারীর বেশে হাতে কেরুয়া ধরিয়া।
নীলজলে পদ্মভেলা চলিল বাহিয়া ॥
ধীর সমীরণে বারি-হিল্লোল বহিছে।
ভেলা-পাশে আসি ধীরে কল্লোল করিছে ॥
বারিবায়ু-হিল্লোলেতে পুলকিত কায়।
বাঁশি-সুরে রামায়ণ সারিগান গায় ॥
তাহে সে হ্রদের শোভা অমর-লষিত। ॥
চারিদিকে ছয় ঘাট স্ফটিক-রচিত ॥
শ্বেত-পাষাণেতে তার বান্ধা চারিধার।
ধবল অচলে যেন জলদ-সঞ্চার ॥
পশ্চিম জলেতে শোভে বন দারুদাম।
বিশাল তমাল-শাল দেখিতে সুঠাম ॥
পূর্ব্বকূলে সুরসাল ফলতরুচয়।
দাড়িম্ব শ্রীফল আম্র স্বাদু সমুদয় ॥
দক্ষিণে কুসুমবনে ফুলের সৌরভ।
জানাইছে জীবলোকে কানন-বৈভব ॥
উত্তরেতে অট্টালিকা বিচিত্র গঠন।
দ্বার প্রসারিয়া বায়ু করে আরোহণ ॥
সরোবর-মধ্যভাগে অতি মনোহর।
ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ এক রহে বারিপর ॥
নবদূর্বা-পরিপূর্ণ শ্যামলবরণ।
নির্মল গগনে যেন মেঘের সৃজন ॥
তাহাতে নির্ঝর-বারি নিয়ত নির্গতি।
যেন বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি পড়ে অবিরত ॥
নৃপসুত বিনোদিনীসহ ভাসে জলে।
হেরি ভানু ত্বরা করি নিজধামে চলে ॥
বিশাল শালের আড়ে লুকাইল রবি।
ক্রমে পূর্বে দেখা দিল শশধর-ছবি ॥
হেরিয়া কুমুদী জলে ঈষৎ হাসিল।
তমালের ডালে-ডালে কোকিল ডাকিল ॥
বারি পরে সন্ধ্যাকালে বসন্ত-সমীরে।
রসিল শরীর-মন নেহারি সমীরে ॥
বিনোদ শয়নে তনু জুড়াবার তরে।
বীরবাহু পদ্মভেলা ফিরালেন ঘরে ॥
হেনকালে যোগিনীর বেশে একজন।
ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন ॥

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা ;
যোজন-যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক আচ্ছাদিয়া।
দূরস্থিত, সন্নিহিত যত শৈলরাজি
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ প্রভায় উজ্জ্বল
অনন্তের সমুদয় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দিকে।
প্রাচীরে-প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ বপু দীর্ঘ, উরস্থান—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম
ভীমদর্পে ভীম তেজে গর্জিয়া-গর্জিয়া,
জাগ্রত, সুসজ্জ, সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ত্মে বর্ত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ সিংহনাদ, অম্বর বিদারি!
অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে ;
রাত্রি-দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ,
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে-দিকে ব্যাপি।
ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে
জ্বলিছে সমর-বহ্নি নিত্য অহরহ ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব সৈন্যদলে।
সুদৃঢ়সংকল্প উভ দেবতা-দনুজে।
অর্ণবের ঊর্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশ, অনুক্ষণ, বিরতি-বিশ্রাম,
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া গতি সিন্ধু-অভিমুখে:
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহ, স্বর্গ-বহির্দেশে,
জয়-পরাজয় নিত্য-নিত্য অনিশ্চয়—

দৈত্যের বিজয় কভু, কখনো ত্রিদশে।
সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জন করি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন (ও) দেবতা!
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে।
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে?
মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন?
ধিক আজি দৈত্য নামে! হে সৈনিকগণ!
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে!
কোথা সে সাহস-বীর্য-শৌর্য-পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির-রণজয়ী?
সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিল কতবার অতুল বিক্রম,
নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে—
পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসীগণে,
জিনিল স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঞ্ছিয়া ;
খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশকবৃন্দের মতো—দৈত্য-অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে!
সেই পরাজিত তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিল সংগ্রামে ;
না পারি জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া
রে ভীরু দানবগণ! নামে কলঙ্কিলা!
আপনি যাইব অদ্য পশিব সমরে ;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ।"
বলিয়া গর্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রম।
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানবসৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরি নিস্তব্ধ সকলে।
"আন রে সে শিবশূল—আন রে অমর-
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা দানিলা শঙ্কর।"

নিরখে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি, শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে বৃংহিত করিয়া।
তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিতমানিকগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত,
কহিলা পিতারে চাহি হয়ে কৃতাঞ্জলি ;—
কহিলা—"হে তাত জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর!
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
করো অবধান পিতঃ, পূরাও বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে।
যশস্বিন্! যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কী উপায় তবে
আত্মজ আমরা তব হব যশোভাগী?
কোনকালে আমরা তবে লভিব সুখ্যাতি,
কীর্তি যাহা—বীরলব্ধ বীরের আরাধ্য,—
বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জন,
কী রাখিলে রণকীর্তি মণ্ডিতে তনয়ে?
ভাবিতে তো হয় তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কীরূপে?
জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে?
জন্ম বৃথা! কর্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি!
কীর্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা।
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়!
বিভব, ঐশ্বর্য, পদ সকলি সে বৃথা!
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের ;
পূজ্য সেই কোনকালে নহে কোনলোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায়!
বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব-সম্পদ-তেজঃ নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব ঘৃণিত!
সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,

তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট,
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।
যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীরুর (ও) অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্যবান!—
বীরের স্বর্গই যশঃ যশই জীবন ;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।
করো অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে দেখো ওই পদরেণু।
জানিবে অসুর-সুর—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।"
   চাহিয়া সহর্ষচিত্তে পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি ;—
"রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ করো যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে ;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজলিয়া দানব-তিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রোজ্জ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিন্যাসিয়া!
অনন্ত তরঙ্গময় সাগরগর্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর ;
গভীর শর্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে সে সুখ—
কিংবা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্বতশৃঙ্গে স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা দেহ পুলকিত
দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখ-বিমিশ্রিত

সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।
সেই সুখ সে উৎসাহ হায় কতকাল
না ধরি হৃদয়ে, জয়-স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্বার,
নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;
দেখো এ ত্রিশূল-অঙ্গে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন কলঙ্ক গভীর!
যাও যুদ্ধে তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে
যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"
রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী,
এ হেন সময়ে দূত নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাস্থলে হইল উপনীত।
দূরে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা "সন্দেশবহ, কী বারতা কহ?
কীরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশিলে তুমি?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী কোথা বা ভীষণ?"
আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন
কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায়,
বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার।
কহিলা "প্রথম যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হতে বহুদূর হিমাচলপথে
উত্তুঙ্গ পর্বত-শৃঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনীসহ।
নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পরে হইনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ ; অতঃপর শেষে
পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।
প্রাচীর-নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে, জাগরিত যথা
সূর্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,

ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।
আসন্ন বিপদ চিত্তে হইল উদয়,
জটিল কৌশল এক গূঢ়প্রতারণা—
ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয়-পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব-দানবে,
সেই সমাচার লয়ে ত্বরিত-গমনে
ঐন্দ্রিলা-নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তার,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান
সমরে সহায় হন এ তাঁর প্রার্থনা।—
এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিল মোরে পুরী প্রবেশিতে :
আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"
 শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর ;—
"এ বারতা দূত তোর অলীক কল্পনা
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য আদি দেবে অবিদিত?"
 দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ কম্পবিরহিত—
যথা নব-কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।
সুমিত্র দানব-মন্ত্রী কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর, দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ (ই) সে শচীসহ
মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"
 নতমুখ নিম্নদৃষ্টি দূত ক্ষুণ্ণমতি,
কহিলা—"না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার
নৈমিষ-অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।"
 "ভীষণ নিহত!"—গর্জিলা দানবপতি।
"হা-রে-রে বালক— জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী!—
দম্ভ তোর এত?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস ;
"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি গাঢ় নিরীক্ষণে—
"যশোলিপ্সা চিতে তব অতি বলবতী,
করো তৃপ্ত জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি ;

শচীরে আনিতে চাই অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন যাহ ধরাধামে ;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে অচিরাৎ পালহ আদেশ।"

কৃতাঞ্জলি হয়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা—"দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কী প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হবেন নির্গত?
যুদ্ধে পরাজয় যদি দেব-অনীকিনী,
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বর কীরূপে
করিবে কুমার কহ, তব অভিপ্রেত।
অসংখ্য এ দেব-সেনা দুর্জয় সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেকো কেহ অন্য-অস্ত্রাঘাতে,
মূর্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।
তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি,
কুমার সংহতি অদ্য, দানব-ঈশ্বর?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কী প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ?"

দৈত্যেশ কহিলা ;—"মন্ত্রী, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে-আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"

নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল,—
"পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সংকট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট-প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, গর্ব প্রকাশিয়া
কহিলা দানবপতি ;—"সুমিত্র হে, এই—
এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বৃত্রের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিংবা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্যে যার অসাধ্য কী তার—
ধরো রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড়!"

রুদ্রপীড় কহে "মন্ত্রী, কেন ত্রস্ত এত?
জান না কি অভেদ্য এ আমার শরীর?

বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখনো
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে।
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা করো দূর,
যাইব অমর-ব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।
হে তাত, ত্রিশূল রাখো, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ;
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।"
এইরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর-সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত-বেশে।
অনুষঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয়-সংকটে।
নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা-দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ ;
যুদ্ধই তাঁহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত।
নিরুপায় কোনো মতে সমরে সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে,
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোনো সদুপায় করিতে সুস্থির।
স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরীমধ্যে, অবলম্বি তাহা,
নির্গত হইয়া গতি কর্তব্য নৈমিষে।
কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোনো,
আসি উপনীত দ্রুত—আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল বিরহিত।
উড়িল কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত ;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোত ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে,

সমরকেতন অন্য হৈল সংকুচিত।
বাজিল সন্তোষ-শঙ্খ, দূত কোনোজন
বার্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চসম্ভাষণে,—
"বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয়পারে,
গন্ধর্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে ;
দেবকুল তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান।"
বার্তা শুনি দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—
মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা,
কী কর্তব্য দানবের এবিধ প্রস্তাবে।
নিষেধ করিলা পাশী—প্রচেতা সুধীর,—
"উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট, বঞ্চক, ক্রূর, দিতিসুত অতি,
নহেকো উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের!
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কী তথাপি সে দূতের বচনে?
সেখানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।"
সূর্য-অভিপ্রায়—"দৈত্য যোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যাক অবিরোধে,
দেব-যোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে।"
অগ্নি কহে—"দুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিকো তার নাহি অনিষেধ,
সসর দৈত্যের সনে যেইখানে যাক,
সম্মুখে পশ্চাতে শত্রু কী তাহে প্রভেদ?
সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে,
অভিমতে দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহার (ই) সহিত।
মহাসেন, সেনাপতি ; সকলের শেষে

কহিলা পার্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্বল
করাই কর্তব্য-কার্য যুদ্ধের বিধানে ;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।
স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হবে পুরী রক্ষক বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।"
সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে,
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত ;
বার্তা লয়ে বার্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড়-সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত ;
মহাহর্ষ হৈল সবে ; দৈত্য যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা,
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী-উদ্দেশে,
নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচী-নিবসতি।

... ...

বৈজয়ন্ত-ধাম এবে দৈত্যালয়,
প্রকোষ্ঠ-অন্তরে তায়,
ইন্দুবালা নাম. রুদ্রপীড়-রামা
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায়।
পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর
পূর্ণকান্তি সুশোভন,
যেন কিশলয় চারু মনোহর
তেমতি দেহ-গঠন।
মধুর সুষমা অতি মৃদুতর
সরস শিরীষ ছলে,
মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন
উছলি-উছলি চলে ;
কাছে বসি রতি করেতে ধারণ
গ্রন্থনরজ্জুর মূল ;
অসম্পূর্ণ মালা উরুদেশ পরে
চারিদিকে আলা ফুল।
অবদ্ধ কুন্তল পড়েছে বদনে
গ্রীবা উরস-পরে,
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল
অর্ধাবৃত শশধরে।
অর্ধভঙ্গ স্বর ভালে ঘর্ম-বিন্দু
রতিরে চাহি সুধায়,

"পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী,
কতদিনে আসা যায়?
নৈমিষ-কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ?
বীর কি সে-জন, সমরে নিপুণ
যশস্বী কি রণে তেঁহ?"
বলিতে-বলিতে মণিবন্ধপরে
আনমনে রাখে কর ;
পরখি আয়তি চেতিয়া অমনি
স্মরে শিব-শিব-হর।
কন্দর্প-কামিনী কহে—"ইন্দুবালা,
চিন্তা কেন কর এত?
পতি সে তোমার সমরে পণ্ডিত
সাধিবেন অভিপ্রেত।
সত্বর ফিরিয়া আসিয়া আবার
মিলিবেন তব সনে,
বীর-পত্নী হয়ে দানব-নন্দিনী,
এত ভয় কেন রণে?"
কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায়! সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে।
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে ক-জন, ভাবে সে ক-জন
বীরপত্নী কীসে হয়!
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কী যুদ্ধপণ ;
যশঃ-তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশঃ কী স্বাদু এমন?
পল-অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি,
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে
সমরের দাহ সহি?"
কহিয়া এতেক উঠি অন্যমনে
অস্থির-চরণে গতি ;
ভ্রমে গৃহ-মাঝে গৃহ-সজ্জা যত
নেহারে যতনে অতি।

"এই জাতি-ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোনো পুষ্প তুলে ;
"এই পালঙ্কেতে বসিবার সাধ"
বলি তাহে বৈসে ভুলে।
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার
খুলি সেই শরাসন,
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ।'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কতদিন
শিরে এই শিরস্ত্রাণ।
কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ।
অতি প্রিয় তাঁর অস্ত্র এইসব
আমার সাধের অতি,
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি একদিন
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়!
মনমথ দিলা তাঁয়,
যুদ্ধ-ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমার গায়!
এবে শুকায়েছে হয়েছে নির্গন্ধ
প্রিয়কর কতদিন,
না পরশে ইহা— সমর-তরঙ্গে
রত তিনি অনুদিন।
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার
সমরে শুধু নিদয় ;
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহাব
কেমনে কঠোর হয়?
আমিও রমণী রমণীও শচী
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায়?
কী হবে শচীর পতি নাই কাছে
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখনো
বিপদে শচীর সম!
ভাবিতে সে-কথা থাকিয়া এখানে
আমার (ই) হৃদয় কাঁপে!

না জানি একাকী গহন কাননে
শচী ভাবে কত তাপে।
ঐন্দ্রিলা-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর দানব-মহিষী
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ!
আমারে না কেন কহিলা মহিষী
আমি সেবিতাম তাঁয়,
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায়?
কেন আ (ই) লা দৈত্য এ অমরালয়ে
আছিল আপন দেশ ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশঃ
কী আশা মিটিবে শেষ?
যার দিয়া তারে ফিরি যদি দেশে
যান পুনঃ দৈত্যপতি,
এ পোড়া আশঙ্কা এ যন্ত্রণা যত
তবে সে থাকে না, রতি!”
রতি কহে “আহা! তুমি ইন্দুবালা
দানব-কুলের মণি।
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি
দেখিলে তাহারে না জানি সে কিবা
ফরিত তোমার চিতে ;
বুঝি শোকভরে ক্ষণমাত্র কাল
এই স্থানে না থাকিতে।
সে অঙ্গ-গঠন মুখের সে জ্যোতি
সে চারু গ্রীবার ভান,
মহিমজড়িত, সে গুরু চলনি
সে উরু উরস-স্থান।
যে দেখেছে কভু চিরদিন তার
হৃদয়ে থাকয়ে পশি,
দেখিলা সে রতি এ পোড়া নয়নে
পূর্ণিমার সেই শশী।
অমরার রানী ইন্দ্রাণী সে শচী
তাহারে কিঙ্করী-বেশে,
রাখিবে এখানে ; রতির অভাগ্যে
দেখিতে হইল শেষে!”

সুকুমার-মতি কহে ইন্দুবালা
"হায়, রতি, কী কহিলা!
এ হেন রমারে করিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা!
আমারে লইয়া কন্দর্প-কামিনী
চলো সে পৃথিবী পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন
ধরিব পতির কর ;
আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে
রাখিবে আমার কথা ;
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কখনো নহে অন্যথা।
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী-বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী।
কী পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না জানি
রমণীর প্রতি বল!
চলো, রতি, চলো লইয়া আমারে
যাব সে অবনীতল।"
কহে কামপ্রিয়া "দৈত্যকুল-বধূ,
তাও কি কখনো হয়?
ভ্রমে চারিদিকে সদা দেব-সেনা
পুরীতে দানবচয়।"
"তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি?"
কহে ইন্দুবালা সতী ;
"যাইতে অবশ্য আছে কোনো পথ
সেই পথে চলো, রতি।"
ইন্দুবালা-বাক্যে মানকেতু-জায়া
কহে "শুন, দৈত্যাঙ্গনা!
যাবে ব্যূহ ভেদি বীর পতি তব
তুমি তো যুদ্ধ জান না।"
না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি
ইন্দুবালা দ্রুতগতি,
গবাক্ষ-সমীপে আসিয়া আতঙ্কে
কহে "ওই শুন রতি!
ওই বুঝি রণ হয় তাঁর সনে
শুন ওই কোলাহল ;

তুমুল সংগ্রাম স্মর-সহচরি
করে দেবাসুর-দল।
নামিতে ধরায় ওই কি সে পথ
ওই দিকে, স্মর-সখি?
তাই বুঝি হায় রুদ্রপীড় ধ্বজ
উড়িছে শূন্যে নিরখি।
শূল-অঙ্কময় বিশাল কেতন
বুঝি বা সে হবে ওই,
এতক্ষণে, রতি না জানি কী হল
কেমনে সুস্থির হই।
শুন ভয়ংকর কিবা সিংহনাদ
অগ্নিময় যেন শিলা,
তাল-তাল-তাল কত অস্ত্ররাশি
নভোদেশ আচ্ছাদিলা।
হায়, রতি, মোরে কে দিবে সংবাদ
কার সনে এই রণ।
এইখানে পতি আছে কি আমার
অনলে দহে যে মন ॥"
কহে কামপ্রিয়া "অয়ি ইন্দুবালা
কই কোথা রণ কই?
স্বপনে দেখিছ সমর এসব
অন্তরে আকুল হই।
আইনু শুনিয়া গিয়াছে ধরায়
তোমার হৃদয়নেতা ;
নাহি কোনো ভয় মিছা এ ভাবনা
রুদ্রপীড় নাহি সেথা।"
শুনি চিন্তাবেগ উপশম কিছু
কহে খেদে ইন্দুবালা,
"পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনী
নিতি-নিতি এই জ্বালা!
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি
পড়ে কত মহাবীর ;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হবে বুঝি শেষ স্থির।
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী
কত পিতা পুত্রহীন,
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ!

যুদ্ধেতে কী লাভ যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম
বুঝি অদৃষ্টের ছলে,
কাম-সহচরি সত্য তোমা বলি
সতত অন্তর জ্বলে!"
"হায় ইন্দুবালা তুমি সুকোমলা
পারিজাতপুষ্প যেন,
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দয় এতই কেন?"
"বল না ও কথা মন্মথ-প্রেয়সী
তুমি সে জান না তায় ;
দেখ না কি কভু শৈল-অঙ্গে কত
স্বাদু নীর-ধারা ধায়;
শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে
বীর তিনি রণপ্রিয়!
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি
ফিরিয়ে আসিলে প্রিয়।
যাব শচী-পাশে করিব শুশ্রূষা
যাতে সাধ দিব আনি,
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না
কহিনু নিশ্চিত বাণী।
মন্মথরমণী! নাহি কর খেদ
যাহ ফিরে নিজবাস,
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস।
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল
থাকিবে অমনি ঢালা ;
এবে গুটাইয়া আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা।
যবে শচী লয়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে।
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে
কে ঢাকিবে তবে আর,"

বলিয়া, লইয়া কুসুমের রাশি
বসিলা গাঁথিতে হার।
"কী মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি
কী মালা গাঁথিতে জান?
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত
তবু না জুড়াত প্রাণ।
দেবকন্যা ধীরে সেবিত নিয়ত
সুমেরু উজ্জ্বল করি,
সে আজ এখানে ঐন্দ্রিলা সেবিয়া
রবে দাসীবেশ ধরি!
এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন
দিয়া তারে পুষ্পহার?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার?
আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে ;
দানবনন্দিনী জান না সে তুমি
দুঃখীরে পূজিলে লাগে।
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বাঁধিয়া পায়!
রতির কপালে এও সে ঘটিল
দেখিতে হইল হায়!"
বলি বাষ্পাকুল- নয়নে তখনি
মন্মথরমণী চলে,
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল
ইন্দুবালা চক্ষুজলে।
পড়ি বিন্দু-বিন্দু কুসুমের স্রজে
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল,
ভাবিয়ে পতিরে ভাবি যুদ্ধভয়
চিন্তাতে হয়ে আকুল।
কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর-রব,
চকিত চঞ্চল প্রতি পলে-পলে
মৃত্যু করে অনুভব ;
সেইরূপ ভয়ে চমকি-চমকি
গাঁথিতে-গাঁথিতে চায়,
ফুলমালা হাতে ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড়-ভাবনায়।

আসি কিছু দূর   দাঁড়াইলা আশা
হাসিয়া মধুর হাসি
পরশি তর্জনী   মম আঁখিদ্বয়ে
কহিলা মৃদুল ভাষি—
"হের বৎস হের   সম্মুখে তোমার
আমার কাননস্থল,
কাননের ধারে   হের মনোহর
ধারা কিবা নিরমল।
নিরখি সম্মুখে   আশার কানন
প্রক্ষালিত ধারা-জলে ;
স্বচ্ছ কাচ যেন   সলিল তাহাতে
উছলি-উছলি চলে ;
কখনো উথলি   উঠিছে আপনি
কখনো হইছে হ্রাস ;
মণি-পদ্ম কত,   মণির উৎপল
ধারা-অঙ্গে সুপ্রকাশ ;
খেলে ধারা-নীরে   তরী মনোহর
হীরকে খোচিত কায়,
প্রাণী জনে-জনে   একে-একে-একে
কত যে উঠিছে তায় ;
বিনা কর্ণদণ্ড   ভ্রমে সে তরণী
খেয়া দিয়া ধারা-নীরে ;
উঠে ক্রমে তাহে   প্রাণী যতজন
পরপারে রাখে ধীরে!
উঠে তীর পরে   প্রাণী হেন কত
যুবা-বৃদ্ধ-নারী-নর,
মনোরথ-গতি   খেলায় তরণী
ধারা-নীরে নিরন্তর।
গগনে যেমন   দামিনী-ছটায়
কাদম্বিনী শোভা পায়,

প্রাণী সে সবার বদন তেমতি
প্রদীপ্ত সুখ-প্রভায়।
চিত্ত-হারা হয়ে হেরি কতক্ষণ
প্রাণী হেন লক্ষ-লক্ষ,
দশ দিক হৈতে আসে সেই স্থানে
তরণী করিয়া লক্ষ।
আশা কহে হাসি চাহি মুখপানে
"কী হেন সংবিদ্‌হারা,
আমার কাননে প্রবেশে যে প্রাণী
তাহারই এমনি ধারা—
হের কিবা সুখ ভাতিছে বদনে
নাচিছে হৃদয় কত ;
বাসনা-পীযূষ- পানে মত্ত মন
চলে মাতোয়ারামতো ;
নন্দনে যেমন নিমেষে নূতন
নবীন কুসুম ফুটে,
নিমিষে তেমতি ইহাদের চিতে
নবীন আনন্দ উঠে,
দেখেছ কি কভু কখনো কোথাও
তরী হেন চমৎকার,
পরশে পরানে বিনাশে বিরাগ
ঘুচায়ে প্রাণের ভাব।
উঠ তরী পরে বুঝিবে তখন
এ কাননে কত সুখ,
নন্দন সদৃশ রচেছি কানন
ঘুচাতে প্রাণীর দুখ।"
এত কয়ে আশা ধরিয়া আমারে
তুলিলা তরণী পর,
অমনি সে ধারা সলিল উথলি
চলে দ্রুত থর-থর ;
দেখিতে-দেখিতে পুরিয়া দুকূল
ছল-ছল চলে জল,
দেখিতে-দেখিতে সলিল ঢাকিয়া
ফুটিল কত উৎপল।
চলিল তরণী গতি মনোহর
মধুর মুরলীধ্বনি,
বাজিতে লাগিল সহসা চৌদিকে
তরীতে সদা আপনি ;

ভুলিলাম যেন এ বিশ্বভুবন
করতলে স্বর্গ পাই ;
চারিদিকে যেন মণিময় পুষ্প
নিরখি যেখানে চাই।
শুনি যেন কেহ কহে শ্রুতিমূলে
"দেখো রে নয়ন মেলি,
কলঙ্কবিহীন মানব-মণ্ডলী
ধরাতে করিছে কেলি ;
স্বর্গ-তুল্য এবে হয়েছে পৃথিবী
স্বর্গের মাধুরীময়,
দ্বেষ, হিংসা, পাপ- বর্জ্জিত পরাণী
নির্ম্মল শুচি হৃদয়!"
হেরি যেন মর্তে তেমতি তরুণ
তেমতি নবীন ভাব
ধরেছে মানব যেদিন বিধির
হৃদি-পদ্মে আবির্ভাব ;
নাহি যেন আর সেই মর্তপুরী
যেখানে দারিদ্র্য-শিখা,
ভস্ম করে নরে, হতাশ-অঙ্গারে
অনলে যথা মক্ষিকা,
হৃদয়-মন্দিরে . যেন অভিনব
কিরণ প্রকাশ পায়,
চুরি করা ধন, ফিরে যেন কাল,
কোলে আনে পুনরায় ;
কত যে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী
উঠিল তখন মম
ভাবিলে সেসব, এখনও অন্তরে
সহসা উপজে ভ্রম!
কতদূর আসি ভাসি হেন রূপে,
তরণী হইল স্থির,
পরপারে আসি আশাসহ সুখে
উতরি ধরার নীর ;
তরী হৈতে তীরে নামিয়া তখন
হেরি মনোহর স্থান ;
"বহিছে সতত শীতল পবন
বিস্তারি মধুর ঘ্রাণ ;
তরু-ডালে-ডালে পূর্ণ প্রকাশিত
সুরভি কুসুমদল :

চন্দ্রমার জ্যোতি সদৃশ কিরণে
উজ্জ্বল কানন-স্থল ;
পল্লবে বসিয়া পাখি নানা জাতি
মধুর কুজিত করে,
নাচিয়া-নাচিয়া গ্রীবাভঙ্গি করি
ময়ূর পেখম ধরে।
কুহু-কুহু-কুহু কুহরে গলায়
কোকিল প্রমত্ত ভাব,
মুহুঃ-মুহুঃ-মুহুঃ তনু-স্নিগ্ধকর
সুগন্ধ সুধার স্রাব!
সরোবর-কোলে প্রফুল্ল কমল
কুমুদ, কহ্লার ফুটে,
গুঞ্জরিয়া অলি কুসুমে-কুসুমে
আনন্দে বেড়ায় ছুটে।
চলেছে সেখানে প্রাণী শত-শত
সদা প্রমোদিত প্রাণ,
সুমধুর সুরে পূরে বনস্থলী
আনন্দে করিয়া গান,
কেহ বা বলিছে আজ নিরখিব
কুমুদ-রঞ্জন শোভা ;
উঠিবে যখন গগনেতে শশী
জগজন-মনোলোভা!
আজি রে আনন্দে ধবিব হৃদয়ে
মধুর চাঁদের কর,
কোমল করিয়া কুসুম সে করে
রাখিব হৃদয় পর!
তাহার উপরে রাখিয়া প্রিয়ারে
কত যে পাইব সুখ।
কখনো হেরিব, গগনে শশাঙ্ক
কখনো তাহার মুখ।"
কহে কোনো জন বেণু-রবে সুখে
"কোথা পাব হেন স্থান!
জগৎ-দুর্লভ রাখিয়া এ নিধি
নিরখি জুড়াই প্রাণ!
দিলা যে গোঁসাই এ হেন রতন
যতনে রাখিতে ঠাঁই,
ভূমণ্ডলমাঝে নিরজন হেন
নয়নে দেখিতে নাই।"

কেহ বা বলিছে "হায় কত দিনে
পাব সে কাঞ্চন-ফল!
নাহি রে সুন্দর দেখিতে তেমন
খুঁজিলে অবনীতল!
সে দুর্লভ ফল কী যে অপরূপ
দেখিতে কিবা সুন্দর,
বুঝি ক্ষিতিতলে অপরূপ তার
নাহি কিছু সুখকর!
পাই দরশন নয়নে কেবল
না লভি আস্বাদ কভু,
হায় মধুময় কিবা সে আনন্দ
কিবা সে আঘ্রাণ তবু ;
না জানি সঞ্চয়ে পাব কত সুখ
ঘুচিবে সকল ভয়,
কভু যদি পাই করিব পৃথিবী
অপূর্ব সৌন্দর্যময়।
ভাবনা কী ছার ছার চিন্তা রোগ
সে ফল যদ্যপি মিলে,
বিনিময়ে তার জীবন পরানী
ক্ষোভ নাহি বিকাইলে।"
চলে কতজন সুখে করে গীত
বলে "কবে পাব যশ,
পরিয়া শিরেতে শোভিব উজ্জ্বল
ধরণী করিব বশ।
পৃথিবী-ভিতরে দ্বিতীয় রতন
কী আছে তেমন আর—
হীরা-মণি হেন চিকন মৃত্তিকা
কেবল যখের ভার!"
বাজিছে কোথাও জয়-জয় নাদে
গম্ভীর দুন্দুভী-স্বর,
চলে প্রাণীগণ করিয়া সংগীত
কম্পিত মেদিনীপর!
বলে "প্রভাকর আজি কী সুন্দর
হেরিতে গগন-ভালে,
আজি মত্ত নদী মাতঙ্গ-বিক্রমে
হেরি কী তরঙ্গ ঢালে!
আজি রে প্রতাপ প্রভঞ্জন তোর
হেরিতে আনন্দ কত,

আজি ধরা তব হেরি অবয়ব
কিবা সুখ অবিরত!
তোলো হৈমধ্বজা গগনের কোলে
কেতনে বিদ্যুৎ জ্বালো—
লেখো ধরাতলে কৃপাণের মুখে
মানব জিনিবে কাল।”
বলিয়া সুসজ্জ তুরঙ্গ-উপরে
ভর করি কতজন,
চলে দ্রুতবেগে শাণিত কৃপাণ
করে করি আকর্ষণ।
দশ দিক হতে কত হেন রূপ
সংগীত শুনিতে পাই,
হরষ উল্লাসে উন্মত্ত পরান
প্রাণী হেরি যত যাই।
যথা সে জাহ্নবী তরঙ্গ নির্মল
ছাড়িয়া শিখরতল,
ভ্রমে দেশে-দেশে শীতল বারিতে
শীতল করি অঞ্চল ;—
ছোটে কল-কল ধ্বনি নিরধারা
ধরণী পরশে সুখে,
বিবিধ পাদপ নানা শস্য-ফল
বিস্তৃত করিয়া বুকে।
খেলে জলচর মীন নানা জাতি
সন্তরণ করি নীরে,
পশু স্থলচর বিবিধ আকৃতি,
সদা ভ্রমে সুখে তীরে ;
তীর-সন্নিহিত বিটপে-বিটপে
পাখি করে সুখে গান,
লতা-গুল্মরাজি বিকাশে সৌরভ
প্রফুল্লিত করি প্রাণ ;
ভ্রমে তটে-তীরে প্রাণী লক্ষ-লক্ষ
সদা প্রমোদিত মন,
আনন্দিত মনে নীরে করে স্নান
সদা সুখে নিমগন ;
যথা সে জাহ্নবী ভারত-শরীরে
বহে নিত্য সুখকর,
বহে নিত্য তথা নিরখি তেমতি
আনন্দ-সুধা-লহর।

দেখি শত পথে ছাড়ি শত দিক
প্রাণীগণ চলে তায় ;
যুবা-বৃদ্ধ প্রাণী পুরুষ-রমণী
ক্ষিতি পুর্ণ জনতায় ;
চলে থাকে-থাকে কাতারে-কাতার
পিপীলির শ্রেণীমতো ;
অসংখ্য-অসংখ্য প্রাণীর প্রবাহে
পরিপূর্ণ পথ যত।
নিরখি কৌতুকে চাহিয়া চৌদিকে
সাগরের যেন বালি—
চলে প্রাণীগণ ঢাকি ধরাতল
চলে দিয়া করতালি ;
অশেষ উৎসাহ আনন্দ-আশ্বাসে
আশারে হেরি তখন ;
জিজ্ঞাসি তাহায় "এরূপ আনন্দে
প্রাণীসবে কোথা যায়,
কী বাসনা মনে চলে কোন স্থানে
কী ফল সেখানে পায়?"
আশা কহে শুনি হাসিয়া তখন
"চলো, বৎস চলো আগে,
প্রাণী-রঙ্গভূমি কর্মক্ষেত্র নাম
নিরখিবে অনুরাগে ;
প্রাণী যত তুমি হের এইসব
সেইখানে নিত্য যায়,
বাসনা-কল্পনা যাদৃশ যাহার
সেইখানে গিয়া পায়।"

... ...

নিকটে আসিয়া নিরখি সুন্দর
অপূর্ব শিখরশ্রেণী ;
শিখরে-শিখরে কনক-প্রদীপ
যেন কিরণের বেণী।
শৈল-চারিদিকে তৃষিত নয়ন
প্রাণী লক্ষ-লক্ষ জন,
কুসুমে গ্রথিত মাল্য মনোহর
শূন্যে করে উৎক্ষেপণ ;
ঘন-ঘন-ঘন হয় জয়ধ্বনি
ক্ষণেক নাহি বিশ্রাম,

যেন ঊর্মিরাশি জলরাশি-অঙ্গে
গতি করে অবিরাম।
প্রাণীবৃন্দ আসি একে-একে সবে
ক্রমে শৈলতলে যায়,
চূড়াতে জ্বলিছে মানিকের দীপ
সঘনে দেখিছে তায়।
সে অচলে হেরি ঘেরি চারিদিক
প্রাণী আরোহণ করে,
আমূল-শিখর শৈল-অঙ্গে প্রাণী
অপরূপ শোভা ধরে!
চলে ধীরে-ধীরে শিরে-শিরে-শিরে
অঙ্গে অঙ্গ পরশন,
অবিরত স্রোত প্রাণীর প্রবাহ
কৌতুক করি দর্শন ;
শিলাতে-শিলাতে পদ রাখি ধীরে
উঠিছে পরানিগণ,
উঠিতে-উঠিতে পড়ে কতজন
স্খলিত হয়ে চরণ ;
বটফল যথা বৃক্ষ হতে সদা
খসিয়া পড়ে ভূতলে,
এথা সেইরূপ প্রাণী নিত্য-নিত্য
খসিয়া পড়ে অচলে।
পড়িয়া-উঠিতে কেহ নাহি পারে
কেহ বা আরোহে পুনঃ,
সে প্রাণী-প্রবাহ অবিচ্ছেদ-গতি
কখনো না হয় ঊন।
লয়ে নিজ-নিজ যে আছে সম্বল
উঠিছে যতনে কত,
শিখরে-শিখরে কনক-প্রদীপ
নেহারে সুখে সতত।
উঠে প্রাণীগণ দীপ লক্ষ করি
শীত-গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান,
মন্ত্র করি সার দেহ ভাবি ছার
পণ করি নিজ প্রাণ।
কাহার মস্তকে মণি-মুক্তারাশি
উপাধি কাহার শিরে,
কাহার সম্বল নিজ বুদ্ধিবল
অচলে উঠিছে ধীরে ;

গ্রন্থ রাশি-রাশি লয়ে কোনজন
কার করতলে তুলি,
কেহ বা ধরিছে যতনে কক্ষেতে
কাব্য-গ্রন্থ কতগুলি ;
কেহ বা রূপের ডালি লয়ে ফিরে
চলেছে সুরূপা নারী,
চলেছে গায়ক নাটক-বাদক,
বীণা-বেণু-আদি-ধারী।
উঠিতে বাসনা করে না অনেকে
আসিয়া ফিরিয়া যায়,
নীচে হতে শূন্যে ফেলি ফুল-মালা
সেই অচলের গায়।
বহুজন পুনঃ করিয়া প্রয়াস
উঠিছে অচলদেশে,
পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবার
নামিয়া আসিছে শেষে।
জিজ্ঞাসি আশারে "প্রাণী-রঙ্গভূমে
কিবা হেরি এ অচল?"
আশা কহে "বৎস, যশঃশৈল ইহা
অতি মনোরম্য স্থল।"
বাড়িল কৌতুক উঠিতে শিখরে
আনন্দে আগ্রহে যাই,
আগে-আগে আশা চলিল সম্মুখে
অচলে পথ দেখাই ;
উঠিতে-উঠিতে শুনি শূন্য পরে
সুমধুর ধ্বনি ঘন,
মস্তক-উপরে ঘুরিয়া যেমনি
সতত করে ভ্রমণ ;
যেন শত বীণা বাজিছে একত্র
মিলিত করিয়া তান,
শ্রবণে প্রবেশ করিলে তখনি
পুলকিত করে প্রাণ।
শূন্যে দৃষ্টি করি রোমাঞ্চ শরীর
বিস্ময় ভাবিয়া চাই,
কিবা কোনো যন্ত্র কিবা বাদ্যকর
কিছু না দেখিতে পাই।
হাসি কহে আশা "বৃথা আকিঞ্চন
দৃষ্টি না হইবে নেত্রে,

এ মধুর ধ্বনি নিত্য এইরূপে
নিনাদিত এই ক্ষেত্রে ;
বীণা কি বাঁশরি কিংবা কোনো যন্ত্র
নিঃসৃত নহেকো স্বর,
স্বতঃ বিনির্গত সুললিত সদা
ভ্রমে নিত্য গিরিপর ;
সদা মনোহর বায়ুতে-বায়ুতে
বেড়ায় ঝংকার করি,
কমলের দল বেষ্টিয়া যেমন
ভ্রমর ভ্রমে গুঞ্জরি।"
শুনিতে-শুনিতে আশার বচন
ক্রমশ অচলে উঠি,
যত উর্ধ্বে যাই তত সুমধুর
ধ্বনি ভ্রমে সেথা ছুটি।
ছাড়ি অধোদেশ উঠিনু যখন
মধ্যভাগে গিরিকায় ;
শরীর পরশি ধীরে-ধীরে-ধীরে
বহিল মৃদুল বায়!
সে বায়ুতে মিশি সুমধুর ঘ্রাণ
করিল আমোদময় ;
যেন সে অচল সুরভি মধুর
সৌগন্ধে ডুবিয়া রয় ;
অগুরু-চন্দন জিনিয়া সে গন্ধ
পুষ্পগন্ধ যেন মৃদু ;
মরি কী মধুর মনোহর যেন
দেবের বাঞ্ছিত মধু।
ভ্রমিছে সে গন্ধ ঘেরিয়া অচল
প্রতি শিখরের চূড়ে ;
ছুটিছে পবন সে ঘ্রাণ নিয়ত
কতই যোজন জুড়ে ;
নাহি হয় হ্রাস ক্রমে যত যাই
ক্রমে বৃদ্ধি তত হয়,
নাসারন্ধ্র যেন ঘ্রাণপূর্ণ করি
প্রাণ করে মধুময়।
সেই গন্ধে মজি শুনি সেই ধ্বনি
ভ্রমি সে অচল পরে
ভ্রমিতে-ভ্রমিতে কত কী অদ্ভুত
দেখি চক্ষে সুখভরে ;

নিরখি তাহার কোনো বা শিখরে
প্রাণী বসি কোনোজন,
অসুর সুসাধ্য অসম্ভব ক্রিয়া
নিমিষে করে সাধন ;
কোনো গিরিচূড়ে বসি কোনো প্রাণী
মণিদণ্ড হেলাইছে,
ক্ষণপ্রভা তার বশবর্তী হয়ে
চরাচর ঘুরিতেছে ;
কোনো বা শিখরে বসি কোনো জন
তোলে ভোগবতী-জল,
কেহ বা করেতে আকর্ষণ করি
ঘুরায় বিশ্বমণ্ডল,
কেহ বা নক্ষত্র গ্রহ, ধূমকেতু
ধরিয়া দেখায় পথ,
লক্ষ করি তাহা শূন্যমার্গে উঠে
ভ্রমে সবে চক্রবৎ ;
কেহ বা ভেদিয়া সূর্যের মণ্ডল
আচ্ছাদন খুলে ফেলি,
আনন্দে দেখিছে বাষ্প সরাইয়া
নিবিড় বিদ্যুৎ-কেলি,
কেহ শূন্য হৈতে পাড়ি চন্দ্র-তারা
করতলে রাখে ধরি,
পুনঃ ছাড়ি দেয় সর্ব অঙ্গ তার
সুখে নিরীক্ষণ করি ;
দেখি কোনো চূড়া উপরে বসিয়া
সুদিব্য-মুরতি প্রাণী,
তন্ত্রী বাজাইয়া মনের আনন্দে
ঢালিছে মধুর বাণী ;
কোনো শৃঙ্গে হেরি প্রাণী কোনোজন
মস্তকে কাঞ্চনময়,
জ্বলিছে মুকুট শিখর-উপরে
হয় যেন সূর্যদয় ;
হেরি দিব্য মূর্তি দিব্যাসনোপরে
প্রাণী বৈসে কোথা সুখে,
ধক্-ধক্ করি হীরা-খণ্ড সদা
প্রদীপ্ত হইছে বুকে ;
হেরি কত ঋষি স্থির শান্ত প্রাণ
বসিয়া অচল-অঙ্গে,

গ্রন্থ করে পাঠ যেন ধ্যান ধরি
ভাসিছে ভাব-তরঙ্গে।
হেরি অপরূপ অচল-প্রকৃতি
প্রাণীগণ যত উঠে,
ছাড়ি মধ্যদেশ স্থির হয় যেথা
সেইখানে পদ্ম ফুটে।
তখনি শিখরে হয় শৃঙ্গনাদ
দশ দিক শব্দে পূরে,
অচল-শরীর কাঁপায়ে নিনাদ
প্রবেশে অমরপুরে।
প্রাণী সেইজন এবে দিব্য মূর্তি
বৈসে চারু পুষ্পপর,
উঠে অন্য যত সে অচল-অঙ্গে
পূজে তারে নিরন্তর।
স্তবকে-স্তবকে সে ভূধর-অঙ্গে
কত হেন পদ্মফুল,
উপরে-উপরে দেখিলাম রঙ্গে
কৌতুকে হয়ে আকুল।
বিস্ময়ে তখন জিজ্ঞাসি আশারে
আশা মৃদু ভাষে কয়,
"ত্যজে জীবলীলা প্রাণী যে এখানে
এইভাবে হেথা রয়।
প্রাণী-রঙ্গভূমে জানাতে বারতা
হয় শূন্যে সিংহনাদ,
শিখর-উপরে আইসে দেবগণ
করিয়া কত আহ্লাদ।
এই যে দেখিছ প্রাণী যতজন
পদ্মাসনে আছে বসি,
ধরার ভূষণ প্রলয়ে অক্ষয়
মানব-চিত্তের শশী।
দেখো গিয়া কাছে তব পরিচিত
প্রাণী এথা পাবে কত,
বদন হেরিয়া করিয়া আলাপ
পূর্ণ করো মনোরথ।"
একে একে আশা কানে কহি নাম
চলিল দেখায়ে রঙ্গে,
পুলকিত তনু দেখিতে-দেখিতে
চলিনু তাহার সঙ্গে।

ব্যাস, কালিদাস, ভারতী প্রভৃতি
চরণ বন্দনা করি,
শঙ্কর-আচার্য খনা লীলাবতী
মূর্তি হেরি চক্ষু ভরি।
উঠিনু সেখানে যেখানে বসিয়া
বাল্মীকি অমরপ্রায়,
আনন্দে বাজায়ে সুমধুর বীণা
শ্রীরামচরিত গায়।
দেখিয়া আমারে অমর ব্রাহ্মণ
দয়ার্দ্র-মানস হয়ে,
দিলা পদধূলি স্বদেশী জানিয়া
আশু শিরোঘ্রাণ লয়ে।
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা
কেবা রাজ্য করে তায়,
ভারতীর পুত্র কেবা আর্যভূমে
তাঁহার বীণা বাজায়।
কোন বীরভোগ্যা এবে আর্যভূমি
কোন ক্ষত্রী বলবান,
দৈত্য-রক্ষঃকুল করিয়া দমন
রক্ষা করে আর্যমান।
কোন আর্যসুত যশঃ-প্রভাগুণে
স্বদেশ উজ্জ্বল মুখ,
দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন নারী
স্নিগ্ধ করে পতি-বুক ;
কেবা রক্ষা করে বেদবিধি ধর্ম
কোন বুধ মহামতি,
ব্রাহ্মণকুলের তিলকস্বরূপ
সাধন করে উন্নতি ;
কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারতা
শুধাইয়া বারংবার,
কী দিব উত্তর ভাবিয়া না পাই
চক্ষে বহে নীরধার।
হেরে অশ্রুধারা করুণ-বাক্যেতে
ঋষি অতি ব্যগ্রমন,
আগ্রহে আবার অতি সযতনে
কৈলা মোরে সম্ভাষণ।
কহিনু তখন "কী বলিব ঋষি
কী দিব সংবাদ তার—

তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল
সে আর্য নাহিকো আর ;
ডুবেছে এখন কলঙ্ক-সলিলে
নিবিড় তামসী তায়,
সে ধনু-নির্ঘোষ সে বীণা-ঝংকার
আর না কেহ শুনায়।
নিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ, ক্ষত্রকুল
বেদধর্ম সর্ব গিয়া,
ভাসে পুণ্যভূমি অকূল পাথারে
পরমুখ নিরখিয়া।"
সে বচন শুনি আর্য-ঋষিমুখ
ধরিল যে কিবা ভাব,
কী যে ভয়ংকর ধ্বনি চতুর্দিক
আর্য-মুখে ঘনস্রাব ;
ভাবিতে সে কথা এখন(ও) হৃদয়
ভয়েতে কম্পিত হয়,
অন্তরে অঙ্কিত রবে চিরদিন
বাণীতে প্রকাশ্য নয়।
যত ছিল সেথা আর্য-কুলোদ্ভব
মহাপ্রাণী মহোদয়,
ঘোর বজ্রাঘাতে একবারে যেন
আকুলিত সমুদয়।
সে দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া সে ভাবে
আর্যসুতে চিন্তাকুল ;
তুলিয়া দর্পণ আশা কহে "ইথে
চাহি দেখো আর্যকুল।
দেখো রে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ
ভারত কীরূপ বেশ,
দেখে একবার প্রাণের বেদনা
ঘুচা রে মনের ক্লেশ।"
দেখিলাম চাহি যেন পূর্বদিক
জ্বলিছে কিরণময়,
ভারতমণ্ডল সে কিরণে যেন
প্রদীপ্ত হইয়া রয়।
ভারত-জননী যেন পুনর্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে,
ফুটিয়াছে যেন তেমতি আবার
পূর্বতেজ হাস্যাননে।

ঘেরিলা তাহারে নব আর্যজাতি
কিরীট-কুণ্ডল তুলি,
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল
ঝাড়িয়া কলঙ্ক-ধূলি।
নবীন পতাকা তুলিয়া গগনে
ছুটেছে আবার দূত,
ভুবন-ভিতরে করি ঘন নাদ
বদনে প্রভা অদ্ভুত।
দিকদশবাসী মানবমণ্ডলী
আনি সপ্ত সিন্ধুজল,
করে অভিষেক বলে উচ্চনাদে
জাগ্রত আর্যমণ্ডল।
পশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর-ধ্বনি
আনন্দ-সংগীত গায়,
উঠে সিন্ধুবারি ভারত প্রক্ষালি
আবার গর্জিয়া ধায় ;
উঠে হিমালয় পুনঃ শূন্য ভেদি
পূর্বের বিক্রম ধরি,
ছুটে পুনরায় জাহ্নবী-যমুনা
গভীর সলিলে ভরি।
আনন্দে আবার ভারত-সন্তান
বীণা ধরে করতলে,
আবার আনন্দে বাজায়ে দুন্দুভি
বসুন্ধরা-মাঝে চলে।
দেখে সে দর্পণে অপূর্ব প্রতিমা
হরষ-বাষ্পেতে আঁখি,
পূরিল অমনি ফুটিল বাসনা
হৃদয়ে তুলিয়া রাখি।
দেখিতে-দেখিতে সে দর্পণ-ছায়া
আরো ঊর্ধ্বভাগে যাই,
স্তরে-স্তরে যেন হেরি সে ভূধর
উঠে শূন্যে যত চাই।
আশা কহে "বৎস, কত দূরে যাবে
নাহি পাবে এর পার,
যতদূর যাবে ততদূর ক্রমে
শৃঙ্গ পাবে অন্য আর।"
আশার বচনে ক্ষান্ত হয়ে ফিরি
পুনঃ সে অচল-অঙ্গে,

নামি কিছু দূর নিরখি যেখানে
সুকবি কঙ্কণে রঙ্গে।
পদতলে তার দেখি মনসুখে
বসিয়া ভারত দ্বিজ,
বাজাইছে বাঁশি মধুর সুরবে
ছড়াইয়া রস নিজ!
ক্রমে ভূমিতলে অবতরি পুনঃ
তবু যেন প্রাণ-মন,
করে আকিঞ্চন গিরিতলে থাকে
সুখে আর কিছুক্ষণ!
যথা নীর হৈতে করিয়া হরণ
অরণ্যে পক্ষিশাবক,
দ্রুতবেগে গতি করে গৃহমুখে
দুরন্ত কোনো বালক।
তখন যেমন সেই পক্ষীশিশু
চায় দুঃখে নীড়পানে,
কাকলি করিয়া মৃদু আর্তস্বরে
আকুলিত হয় প্রাণে।
সেইভাবে এবে ফিরিয়া-ফিরিয়া
অচল-শিখরে চাই,
মুকুট উজলি জ্বলে হেম-দীপ
হেরিতে-হেরিতে যাই।

… …

যথা যবে ঋতু সরস বসন্ত
প্রবেশে ধরণী-মাঝে,
শোভে তরুলতা ধরি চারুবেশ
নবীন-পল্লব-সাজে ;
ঝরে ধীরে-ধীরে পত্র পুরাতন
ছাড়িয়া বিটপী-অঙ্গ,
চারু কিশলয় প্রকাশিত ধীরে
পাইয়া মলয়-সঙ্গ।
নব চারু মুগ্ধ কিশলয় যত
হরিত-বরণ শাখা,
পরিয়া সুন্দর মঞ্জরী মধুর
বিকাশে তরুর শাখা।
সে বসন্তকালে যথা অপরূপ
আনন্দ উথলে মনে,

হৃদয়ে অব্যক্ত সুখের প্রবাহ
প্রকাশ্য নহে বচনে ;
এখানে প্রবেশি তেমতি আনন্দ
উপজে হৃদয়ময়,
শীত-স্নিগ্ধ-রস যেন সে এখানে
বায়ুতে মিশ্রিত রয় ;
উদ্যান রচিত দেখি চারিদিক
প্রকাশিত চারু ছবি,
স্তবকে-স্তবকে সাজিছে সুন্দর
বিবিধ শোভা প্রসবি ;
অতি মনোহর উদ্যানে সেসব
পার্শ্বে-পার্শ্বে অবস্থিত,
অঙ্গে-অঙ্গে মিশি মধুচক্রে যেন
অপূর্ব বিন্যাস-রীতি,
প্রবেশের মুখ পৃথক সকল
তথাপি মিলিত সব ;
প্রতি উপবনে নব-নব ঘ্রাণ
সদা হয় অনুভব।
আশা কহে "বৎস, আমার কাননে
স্থির শান্তি এই দেশ,
ভ্রমিলে এখানে কিছুকাল সুখে
ভুলিবে পথের ক্লেশ।
দেখো ভিন্ন-ভিন্ন যত উপবন
ভিন্ন-ভিন্ন স্নেহ-স্থান।
সৌহার্দ্য, প্রণয় প্রভৃতি সে রস
সদা-স্নিগ্ধ করে প্রাণ।
উচ্চ-কোলাহল কটু-তিক্ত স্বর
না পাবে শুনিতে এথা,
ধীরে-ধীরে গতি ধীর মিষ্ট ভাষা
এখানে প্রাণীর প্রথা ;
সবে সত্যবাদী সবে সত্য ভাব
পরিসঙ্গ প্রাণে-প্রাণে,
এখানে প্রাণীরা দেশ-হিংসা-ছল
কেহ কভু নাহি জানে।
এখানে নাহিকো ষড়ঋতু-ভেদ
সমভাবে সূর্যোদয়,
আমার কাননে স্নেহময় প্রাণী
এই স্থানে তারা রয়।"

এত কয়ে আশা প্রণয়-কাননে
হাসিয়া করে প্রবেশ,
অতুল আনন্দে মাতিল হৃদয়
হেরিয়া মধুর দেশ।
লতা-গৃহ সেথা হেরি চারিধারে
অপূর্ব কিরণময়,
অমরাবতীতে যেন দেব-গৃহ
তারকা-ভূষিত রয়।
পুষ্পময় পথ মৃত্তিকা-পরশ
নাহি হয় পদতলে,
তরু হৈতে স্বতঃ চারু সুকুমার
পুষ্প হতে বৃষ্টি ছলে।
প্রতি গৃহদ্বারে সুখে চক্রবাক
চকোর ভ্রমণ করে।
বায়ুর হিল্লোলে নিরবধি যেন
সুধাধারা সেথা ঝরে।
শোভে তরুরাজি সে প্রদেশময়
ধরে অপরূপ ফুল,
অপূর্ব প্রকৃতি অবনী-ভিতরে
নাহিকো তাহার তুল ;
যতক্ষণ থাকে শাখার উপরে ;
শোভামাত্র দৃষ্টি তার,
মধুর সৌরভ বহে সে কুসুমে
গাঁথিলে হৃদয়ে হার ;
আপনি গ্রথিত হয় সে কুসুম
বৃন্তে-বৃন্তে শত জুড়ে,
কিন্তু পুনঃ আর নাহি যুগ্ম হয়
বারেক যদ্যপি তুড়ে।
প্রতিক্ষণে ধরে নব-নব ভাব
নবীন মাধুরী তায় ;
নেহারি আনন্দে প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে
নূতন পত্র ছড়ায়,
প্রতিক্ষণে তাহে নবীন সৌরভে
নবীন পরাগ উঠে,
আসিলে নিকটে আপনা হইতে
তরু ছাড়ি হৃদে লুটে।
কত তরু হেন নিরখি সেখানে
শ্রেণীবদ্ধ দলে-দলে

ভ্রমে সুখে কত যুগল পরাণী
নিয়ত তাহার তলে,
করতল পাতি তরুতলে যায়
সেই মনোহর ফুল ;
পড়ে কত তায় পরাণী সকলে
আনন্দে হয় আকুল ;
পাতিয়া অঞ্চল দাঁড়ায় দুজনে
গিয়া কোনো তরুমূলে
মুহূর্ত-ভিতরে পরিপূর্ণ তাহা
হয় মনোমতো ফুলে।
প্রতি তরুতলে ভ্রমে দুই প্রাণী
তরু বৃষ্টি করে ফুল,
যেন বা আনন্দ হেরিয়া তাদের
আনন্দিত তরুকুল।
যথা সে পবিত্র কণ্বের আশ্রমে
হেরে শকুন্তলা-সুখ ;
শাখা নত করে পুষ্প ছড়াইল
ফুল-তরু ফুল্ল-মুখ ;
সেইরূপ হেরি প্রণয়ী যখন
আসে এথা তরুতলে,
তরু নত-শিরে করে আশীর্বাদ
বরষি কুসুমদলে।
সে ফুলের মালা পরিয়া গলায়
প্রণয়-প্রফুল্ল প্রাণ,
হেরি কত প্রাণী ভ্রমিছে সেখানে
লভিয়া কুসুম-ঘ্রাণ ;
চাঁপা ফুল হেন বরণের শোভা
সুন্দর নলিন আঁখি,
চলে কত রামা বল্লভের দেহে
সুখে বাহুলতা রাখি।
কোনো সে যুবক চলে মনসুখে
বাঁধি নিজ ভুজপাশে,
কমল-কোরক সদৃশ তরুণী
অর্ধস্ফুট মৃদু হাসে।
চলেছে সোহাগে কোনো বা সুন্দরী
ফুল্ল-বিকশিত ছবি,
লোহিত সুন্দর গণ্ডে প্রস্ফুটিত
গুলাবরঞ্জিত রবি ;

আহা কোনো রামা স্মিতচারুমুখী
প্রণয়ীর বাহুমূলে,
চন্দ্রকরমাখা শেফালিকা যেন
চলেছে গুণ্ঠন খুলে।
কাহার বদনে ফুটিয়া পড়েছে
মধুর মৃদুল হাস,
সহকার-কোলে সরস মঞ্জরী
বসন্তে যেন প্রকাশ।
চলেছে মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটিতে
কোনো রামা মনসুখে,
পূর্ণ ষোলোকলা যৌবনে প্রকাশ
আড়ে হেরি প্রিয়মুখে।
প্রিয় চারু করে রাখি নিজ কর
প্রফুল্ল উৎপল যেন,
চলেছে চঞ্চল পঙ্কজ-নয়না
আহা কত রামা হেন।
নীলপদ্ম যেন ভ্রমে কত নারী
মধুর মাধুরী ধরি,
সুখিনী মহিলা প্রিয়-অঙ্গে-অঙ্গে
সুখে সুমিলন করি।
দেখি স্থানে-স্থানে কৌতুকে সেখানে
কত উৎস মনোহর,
সুধার সংকাশ সলিল ছড়ায়ে
পড়িছে সহস্র ঝর ;
পড়িছে নির্ঝর মরি রে তেমতি
চারিধারে ধীরে-ধীরে,
পুরাণে লিখন জাহ্নবী যেমন
জটায় শিবের শিরে।
কোথা সে ভূতলে ভূপতি-ভবনে
শ্বেত-শিলা বিরচিত,
ক্রীড়া-উৎস নব মহিষী-মোহন
মানিক্য-স্বর্ণ-মণ্ডিত!
উঠিছে নির্ঝর সে কাননময়
নিত্য ক্ষিতিতল ফুটে ;
শত-ধারা হয়ে ভাঙিয়া-ভাঙিয়া
পুষ্প যেন পড়ে ফুটে।
নীল-কৃষ্ণ-শ্বেত আদি বর্ণ যত
নিন্দিত করি শোভায়,

প্রতি ধারা-অঙ্গে কত রঙ্গে তাহে
অপূর্ব বর্ণ ছড়ায়।
ঝরিছে নির্ঝর ধারা হেন কত
প্রণয়-অঞ্চল-অঙ্গে,
দেখিলে নয়নে ফিরিতে না চায়
নেহারে ভুলিয়া রঙ্গে।
ফুটে কত ফুল ঘেরি উৎস সব
অমর-নন্দন-ভাতি,
নন্দনে তেমন বুঝি বা সুন্দর
নাহি পুষ্প হেন জাতি।
অতুল সৌন্দর্য সেসব কুসুমে
নাহি কভু বৃদ্ধি-হ্রাস,
নিরবধি শোভা ফুটে সমভাবে
নিরবধি ছুটে বাস।
অতি শূন্যগামী চকোর প্রভৃতি
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যত,
মৃদু কলস্বরে ধারা ধারে-ধারে
সুখে ভ্রমে অবিরত।
হেরি কত প্রাণী আসি উৎসপাশে
ধারা-জলে করি স্নান,
নিমেষ-ভিতরে নির্মল শরীর
ধরে সুধাসম ঘ্রাণ।
হেরি কত পুনঃ পরানী বিস্ময়ে
পরশনে সেই বারি,
পাষাণ হইয়া হারায় সংবিৎ
চলিতে চিন্তিতে নারি।
কত যে পুরুষ হেরি হেন ভাব
নিশ্চল নির্ঝর-পাশে,
কত সে রমণী পাষাণ-মুরতি
চক্ষুজলে সদা ভাসে।
চিন্তিয়া না পাই কারণ তাহার
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন সে প্রাণীরা সলিল-পরশে
থাকে হেন ভাব ধরি?
হাসি কহে আশা "শুন রে বালক
অতি শুচি অই জল ;
পবিত্র মানস প্রাণী যেইজন
পরশি হয় শীতল।

অপবিত্র দেহ অপবিত্র প্রাণ
যে ইহা পরশ করে,
তখনি সেজন সলিল-মাহাত্ম্যে
পাষাণ-মুরতি ধরে ;
কাঁদে চিরকাল এইভাবে সদা
চলৎশকতি-হীন ;
অনুতাপ হেরে অন্য প্রাণী যত
স্নিগ্ধ হয় অনুদিন।
সতী-ঝর নামে এসব নির্ঝর
সুপবিত্র বারি অতি,
পরশে যে নারী সলিল ইহার
লভে যশঃ নাম সতী।
পুরুষ যেজন করে ইথে স্নান
জিতেন্দ্রিয় নাম তার ;
ধরাধামে থাকি লভে স্বর্গ-সুখ
আনন্দ লভে অপার।
কঠোর সাধনা প্রণয়ে যাহার
পবিত্র নির্মল মন,
পর-চিন্তা চিতে জনমে যে প্রাণী
করে নাই কোনো ক্ষণ।
সেই নারী-নর পরশে এ বারি
অন্যে না ছুঁইতে পারে,
অন্যে যে পরশে অপবিত্র মনে
এই দশা ঘটে তারে।"
নিরখি নির্ঝর নিকটে সেসব
ভ্রমে প্রাণী একজন,
মধুময় হাসি মধুর মাধুরী
অঙ্গেতে করে ধারণ,
অতি সুললিত আকৃতি তাহার
দেহকান্তি নিরুপম,
মুখে দিব্য ছটা অধরে সতত
মৃদু হাসি সুধাসম ;
গলে প্রস্ফুটিত প্রীতিকর দাম
গ্রথিত অপূর্ব ফুলে ;
স্বতঃ নিনাদিত মধুর বাদিত্র
লম্বিত বাহুর মূলে ;
সুখে করি গান ভ্রমে ঝরে-ঝরে
সরল সুমিষ্ট ভাবে,

বিমল বদন নিরমল জ্যোতি
সূর্য-আভা পরকাশে ;
নির্ঝর-বিলাসী প্রাণীগণ তারে
কত সমাদর করে,
বসায়ে নিকটে আনন্দে বিহ্বল
শুনে গীত প্রেমভরে।
হেরি কতক্ষণ জিজ্ঞাসি আশারে
কেবা সে অপূর্বজন,
তুষি এ সবারে নির্ঝরে-নির্ঝরে
এরূপে করে ভ্রমণ?
আশা কহে হাসি "এই সে পরানী
দেখিতে হেন সুঠাম,
প্রণয়-কাননে চিরদিন বাস,
সন্তোষ ইহার নাম।"
সে যুবা-প্রসঙ্গে করি আলাপন
আশার সহ উল্লাসে,
চলিতে-চলিতে আসি কিছুদূর
এক লতাগৃহ-পাশে ;
হেরি তার মাঝে প্রাণী একজন
অন্যজন পাশে বসি,
মেঘের আড়ালে উদয় যেমন
পূর্ণকলা চারু-শশী।
বসি তার কাছে সতৃষ্ণ নয়ন
চাহিয়া বদন তার,
কতই শুশ্রূষা কতই যতন
করে হেরি অনিবার।
নির্বাণ-উন্মুখ প্রদীপ যেমন
ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে জ্বলে,
প্রাণী সেইজন বিকাশে তেমতি
কিরণ মুখমণ্ডলে,
নাহি অন্য আশা নাহি অন্য তৃষা
কেবল বদনে চায়,
সূর্য-অংশু-রেখা পড়ে যদি তাহে
কেশজালে ঢাকে তায়।
নিস্পন্দ শরীর যেন সে অসাড়
হৃদয় ছাড়িয়া প্রাণ,
আসিয়া যেমন নিবিড় হইয়া
নয়নে পেয়েছে স্থান।

মলিন বদন প্রাণী অন্যজন
দেখাইছে বিভীষিকা,
কত যে প্রকারে নিমেষে-নিমেষে
বর্ণনে অসাধ্য লিখা ;
কখনো বা বেগে কণ্ঠে চাপি কর
করিছে নিশ্বাস রোধ ;
কখনো বা নখে ছিঁড়ি ওষ্ঠাধর
উঠিছে করিয়া ক্রোধ ;
কখনো মাটিতে ভাঙিছে ললাট
রুধির করিছে পাত,
কভু সর্বঅঙ্গে ধূলি ছড়াইয়া
বক্ষে করে করাঘাত ;
কখনো গর্জন করিছে বিকট
দন্তে-দন্তে ঘরষণ,
কখনো পড়িছে ধরাতলপরে
সংজ্ঞাহীন বিচেতন।
প্রাণী অন্যজন নিকটে যে তার
কতই যতনে হায়,
সেবিছে তাহায় করিছে শুশ্রূষা
ঘুচাইতে সে মূর্ছায়।
কভু ধীরে-ধীরে করশাখা খুলে
মার্জিছে হৃদয়দেশ ;
কভু করতল কভু পদতালু
কভু ঘর্ষে ধীরে কেশ।
কখনো তুলিছে হৃদয়-উপরে
অবসন্ন বাহুলতা,
কভু স্নেহপূর্ণ বলিছে শ্রবণে
পীযূষ-পূরিত কথা।
কখনো আনিয়া বারি সুশীতল
বদনে করে সিঞ্চন,
কখন তুলিয়া মৃদুল সুগন্ধ
নাসাগ্রে করে ধারণ ;
আবার যখন চেতন পাইয়া
হয় সে উন্মাদপ্রায়,
মধুর-মধুর বীণাবাদ্য করি
স্নিগ্ধ করে পুনঃ তায়।
হেরে সে প্রাণীরে কত যে আহ্লাদ
হৃদয়ে হইল মম,

বাসনা ফুটিল যেন নিরবধি
হেরি মুখ নিরুপম।
দেখেছি অনেক প্রণয়ী-পরানী
হেরে পরস্পর মুখ,
নয়ন-হিল্লোলে ভাসি এ-উহার
পিয়ে সুধাসম সুখ ;
বসি নিরজনে করে আলাপন
সুমধুর স্বর মুখে,
প্রেমানন্দে ভোর হইয়া দুজনে
হেরে নিরন্তর সুখে।
কপোতী যেমন কপোতের মুখে
মুখ দিয়ে সুখে চায়,
মৃদু কলধ্বনি মধুর কূজন
কুহরে ঘন গলায়।—
দেখে পরস্পরে দোঁহে মনসুখে
লভিয়া প্রণয়-ঘ্রাণ,
আনন্দ-পুলকে পুলকিত তনু,
সুখে পুলকিত প্রাণ ;—
দেখেছি অনেক সেইরূপ ভাব
প্রণয়-প্রকাশ হায়,
প্রণয়ীজনের প্রেমের অনলে
বদন বহ্নির প্রায় ;
কিন্তু কভু হেন বিশুদ্ধ প্রণয়
নির্মল স্নেহের ক্ষীর,
নাহি দেখি চক্ষে মানব-শরীরে
প্রগাঢ় হেন গভীর।
কতই উৎসুক অন্তরে তখন
হেরি সে প্রাণীবদন,
নব-জলধর নিরখে যেমন
চাতক উৎসুক মন!
অথবা যেমন ধনাঢ্য-আগারে
দুঃখী হেরে ধনরাশি,
সুখে নিরন্তর নিরখি তেমতি
আনন্দ-বাষ্পেতে ভাসি।
পাইয়া সুযোগ গিয়া কাছে তার
বিনয়ে জিজ্ঞাসা করি,

কী রূপে এরূপে থাকে সে সেখানে
একধ্যান চিত্তে ধরি।
কী সুখে উন্মাদে লয়ে করে সেবা
সহে নিত্য এত ক্লেশ,
কেন সে মণ্ডপে জাগ্রত সতত
থাকিতে এতেক দেশ।
সংবদ্ধ বীণাতে পড়িল যেমন
সহসা কাহার কর,
আপনা হইতে উঠে সে বাজিয়া
নিঃসারি মধুর স্বর ;
সেইরূপ ভাব কহে সেইজন
জ্যোৎস্না যেন মুখে ফুটে,
কী সুখ-সম্ভোগ করে সে সতত
কী আনন্দ প্রাণে উঠে।
কহে "সে কেমনে বুঝাব তোমায়
কিবা সে আনন্দে থাকি,
এ লতা-মণ্ডপে বসিয়া ইহারে
কেন এ যতনে রাখি।
প্রণয়ী যে নয় কেমনে বুঝিবে
প্রণয়ের কিবা প্রথা,
মরু কি জানিবে স্রোতোধারা কিবা
মধুময় তরুলতা।
বসি এইখানে দ্যুলোক-ভুবন—
বৈকুণ্ঠ দেখিতে পাই ;
জলনিধি মেঘ বায়ু-ব্যোম-ধরা
সকলি ভুলিয়া যাই!
ভাবি যেন মনে আসি সুরবালা
আনিয়া স্বর্গের রথ,
ঘেরিয়া আমারে লইয়া বিমানে
চলে বহি শূন্যপথ,
প্রবেশি স্বরগে নিরখি সেখানে
নন্দনবনের ফুল,
শুনি বেদধ্বনি হেরি মনসুখে
মন্দাকিনী-নদীকূল ;
দেববৃন্দ সেথা দেখায় আমারে
আনন্দে অমরালয়,
তারা শশধর অমৃত-ভাণ্ডার
সুর-সুখ-সমুদয়।

কেমনে বুঝাব সে সুখ তোমারে
বাণীতে বর্ণিব কিবা—
দিবাকর-জ্যোতিঃ জ্যোতি যে কীরূপ
তাহা সে প্রকাশে দিবা।"
যথা হুতাশন পরশে যেমন
যখন গৃহের ছাদ ;
প্রথমে প্রকাশ ধূম অনর্গল
শেষে অনলের হ্রদ।
বলিতে-বলিতে সেইরূপ তার
বদন পুরে ছটায়,
নেত্রে বাষ্পধূম নিমেষে শরীর
প্রদীপ্ত বহ্নির প্রায়।
পরে পুনরায় সেই প্রাণী-পাশে
এক চিন্তা এক ধ্যান,
ধরিয়া আবার প্রাণী সেইজন
পুনঃ কৈলা অধিষ্ঠান।
নিদাঘ-তাপিত বিহগ যেমন
পাইলে বরষা-জল,
সুখে ধৌত করে আর্দ্র-পক্ষ-ক্লেদ
স্নানে হয় সুশীতল।
শুনে বাণী তার তেমতি শীতল
পরান হইল মম,
হেরি বার-বার ফিরে-ফিরে চাহি
সেই মুখ সুধাসম,
অতৃপ্ত নয়নে হেরি কতবার
ভাবি কত মনে-মনে—
ভাবি নিরমল মাধুরী যেমন
বুঝি নাই ত্রিভুবনে ;
বিস্ময় ভাবিয়া চাহি আশামুখ
আশা বুঝি অভিলাষ,
কহিলা তখন আনন্দে হাসিয়া
বদনে মধুর ভাষ।
"এই যে পরানী এ কাননে মম
হেন সুখী নিরমল,
প্রণয় নামেতে ভুবন-বিখ্যাত
নিত্য সেবে ভূমণ্ডল।"

ছায়াময়ী
১৮৮০

সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি!
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি!—
হি-হি শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট-হাসেতে বিকট ভাবেতে
পূরিছে বিটপি-বন।
কূট করতালি কবন্ধ তালিছে,
ডাকিনী দুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে!
উর্ধ্বচরণে প্রেত নাচিছে
বৃক্ষ হেলিছে ভুঁয়ে,
ক্ষুব্ধ অটবী বিরাট তাণ্ডবে,
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে ;
কন্থা বিথারি বিকট শ্মশানে
বসিছে ভৈরবীপাল,
ভীম-মুরতি শ্মশানে হাসিছে
আলেয়া জ্বলিছে ভাল!
চণ্ড-আরাবে খেলিছে ভৈরব
অস্থি-ভূষণ গলে,
ঠঠ-ঠং-ঠঠ নর-কপাল
শ্মশানভূমিতে চলে।

... ...

চলিল গগনপথে অমর-সুন্দরী
কিরণের রেখামতো শোভা করি নীলপথ
সুধাগন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ করি।

মুদিত নয়ন, ভীত, কম্পিত শরীর
অঙ্কেদেশে দেহধারী এবে শূন্যপথচারী

সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় স্বপনে যেন ঘুমায়
উঠিতে লাগিল ভেদি অনন্ত গভীর!

উতরিল অবশেষে অমরী তখন
গগনের সেই দেশে যেখানে নক্ষত্রবেশে
অনন্ত ভূখণ্ডরাজি করয়ে ভ্রমণ।

প্রবেশে নক্ষত্র এক সে তারারূপিণী
অঙ্ক হতে আপনার রাখিল নিকটে তার
জীবদেহধারী নরে যতনে তাহার পরে
কহিলা মৃদুস্বরে সুমিষ্টভাষিণী—

কহিলা চাহিয়া সুপ্ত মানবের পানে—
"খোলো চক্ষু দেহময় এ ভুবন শূন্য নয়,
ভ্রমিতে পারিবে হেথা যথা ধরাস্থানে।"

সবিস্ময়ে দেহধারী দেখিল তখন
চারিদিক কুহাময়— মর্তে যথা শৈলচয়
উন্নত-বিনত তথা কুয়াসা তেমতি সেথা
নহে সে নক্ষত্র-বপু মণ্ডিত কিরণ।

আশ্বাসিত চমৎকৃত বিনীত-বচনে
জিজ্ঞাসে তখন নর "এ কি পুনঃ ধরাপর
আনিলে আমায় দেবী ঘুমায়ে স্বপনে?"

অমরী কহিল—"দেহী, এ নহে পৃথিবী,
পৃথিবীর অনুরূপ দৃঢ় কুহেলিকা-স্তূপ
অশ্বিনী নক্ষত্র নামে ব্যক্ত যাহা ধরাধামে
এই লোক সে নক্ষত্র—ভুলিও না জীবি!

যত দেখ তারারূপ অনন্ত-শরীরে,
সকলি ইহার প্রায় দৃঢ়-স্থির ধাতুকায়
দূর হতে দেখা যায়—যথা সে মহীরে—

কিরণের রাশিমতো—কিরণমণ্ডল ;
কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি, অতরল শূন্যব্রাজী
মৃন্ময় ধরার প্রায় দৃঢ়ীভূত সমুদায়
মৃত-জীবিতের বাস—প্রাণীময় স্থল।

রচিত খনিজরাজি পৃষ্ঠতলদেশ,
পারদ, রজত, সীস শিলা, স্বর্ণ সুসদৃশ
কত ধাতু মর্তে তার নাহিকো উদ্দেশ।

কারো পৃষ্ঠে অবিরল কেবলি তুষার,
কারো অঙ্গে কুহাচয় কেহ বা সলিলময়
কেহ সূক্ষ্মাকাশা-বৃত কারো অঙ্গে সদা স্থিত
অনল-উত্তাপ তেজ—করিছে বিহার।

জ্যোতির্বিশারদ গুরু ধরাতে যাহারা,
তাহারাই বহু ক্লেশে দেখে এ নক্ষত্রদেশে
স্বরূপ কীরূপ কার কোথায় কী ধারা।

ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে,
আমরা অদেহী প্রাণী অন্য নামে শূন্য জানি
এসব বর্তুলাকার ভুবনে যত বিস্তার
জীবাত্মার কারাগার অন্তরীক্ষতলে।

তাপ-বাষ্প-বৃষ্টি-ধূম-ঝটিকা প্রভৃতি
যেখানে প্রধান যাহা তারি অনুরূপ তাহা
ইহাদের নাম হেথা---যার যে প্রকৃতি।

দেহত্যাগে জীব-আত্মা পরমাত্মা-দেশে,
যাহার যে দুঃখফল ভুঞ্জিবারে সে-সকল
যেখানে আদেশ পায় সেই সে মণ্ডলে যায়
পৃষ্ঠতল ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে।

যতকাল শেষ নহে জীবন-আস্বাদ
অনুতাপ-শিখানলে ততকাল সেই স্থলে,
থাকে সে পরানীপুঞ্জ ভুঞ্জিতে বিষাদ।

সে লালসা নির্বাপিত হয় যেইক্ষণে
সেইক্ষণে মুক্ত প্রাণী তেয়াগি শরীরী-গ্লানি
সূর্য-আভা অবয়বে প্রকাশিত পুনঃ সবে
ত্যজয়ে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে।

তাদেরি অঙ্গের শোভা কিরণ-আকারে,
কাঁপি-কাঁপি ঝিকি-ঝিকি তার অঙ্গে ধিকি-ধিকি
চমকে মানব-চক্ষে শরীরী আঁধারে।

পাপমুক্ত প্রাণীবৃন্দ বিহরে তখন
ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করি তাপিতের তাপ হরি
হিতব্রতে সদা রত আপন সামর্থ্যমতো
বিধির বাঞ্ছিত কার্য করিতে সাধন।

কত হেন মুক্ত জীব মানবমণ্ডলে
ভ্রমে নিত্য নিশাকালে ঘুচাতে ভ্রান্তির জালে
দেখাতে সরল পথ বিপথী সকলে।

কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন,
বিধির বাসনা যেথা গঠিতে নূতন প্রথা
নূতন আকাশ-তারা পৃথিবী নূতন-ধারা
নব রবি নব শশী নূতন ভুবন।

যে-লোকে এখন তুমি দাঁড়ায়ে মানব,
কুহালোক এই স্থান কপটী পাপীর প্রাণ
নিহিত ইহার গর্ভে—ক্ষুণ্ণ-প্রভা সব।

মিথ্যা ভাষা প্রবঞ্চনা করিয়া ধারণ
যে-প্রাণী ধরণীপরে অন্যেরে ছলনা করে
সকল পাপের মূল সেইসব জীবকুল
এই লোক-জঠরেতে ভুঞ্জে নিপীড়ন।"

... ...

প্রবেশি গহ্বর-মুখে শুনিল শরীরী
যেন কত প্রাণীবর একত্র মিশিছে সব
কলরবে সে প্রদেশ পরিপূর্ণ করি।

নিবিড় অরণ্য যথা মারুত-নিস্বনে
পত্র ঝর-ঝরস্বরে, সর্বদিক পূর্ণ করে,
তেমতি অস্ফুট নাদ, ঘন স্বর সবিষাদ
বহে স্রোত নিরন্তর সে ঘোর ভুবনে।

ধূমবর্ণ বাষ্পরাশি—গাঢ়তর ঘন—
ভ্রমে সে প্রদেশময়, সর্বত্র প্রসারি রয়
তমাবৃত নিশামুখে যেমতি গগন,

কিংবা যথা হিমঋতু-প্রদোষ-সময়
গাঢ় কুহেলিকা-জাল ঢাকে মহীতরু-ডাল
সরোবর-পথ-ঘাট শূন্য গিরি-নদী-মাঠ
ধূসরিত কুহাধূমে লুকাইয়া রয় ;

তেমতি কুহেলীচ্ছন্ন নিবিড় সে দেশ ;
গোধূলি-আলোকমতো ধীর-ভাতি দূরগত
কদাচিৎ স্থানে-স্থানে করিছে প্রবেশ।

আলো-অন্ধকারময় বিশাল ভুবন,
জটিল-কুটিল গতি নানাদিকে নানা পথি
চলেছে-ফিরিছে ঘুরে, এই লক্ষ্য কিছুদূরে
প্রবেশি তাহাতে কিন্তু অসাধ্য ভ্রমণ!

অসাধ্য ভ্রমণ যথা কোনো সিদ্ধযোগে
বিদেশি ব্রাজক যবে বুদ্ধিহত স্তব্ধ রবে
কাশী-বর্ত্মে নিক্ষেপিত একা নিশিযোগে।

সতত স্খলিত-পদ শরীরী মানব
চলে অমরীর পাছে ধীরগতি কাছে-কাছে
চলিতে-চলিতে ধীরে হেরে অন্ধকারে ফিরে
কতদিকে কত জীব সংখ্যা অসম্ভব।

হেরে দেহধারী ভয়ে রোমাঞ্চিতকায়—
কবন্ধ-সদৃশ সব . বক্রগ্রীবা ক্ষীণরব,
পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে পৃষ্ঠভাগে চায়।

না পায় দেখিতে অগ্রে—নেত্র-নাসা-মুখ
ঘুরানো পৃষ্ঠের দিকে কেহ নাহি চলে ঠিকে
ঘুরুলে বায়ুরমতো ঘুরিয়া বেড়ায় পথ,
বাক্য-নিঃসরণে যেন কতই অসুখ।

চলে সবে করে চাপি কঠিন কর্ষণে
কণ্ঠতল মুহুর্মুহু, বেদনা যেন দুঃসহ
নিয়ত ব্যথিছে কণ্ঠ শ্বাস-প্রসারণে!

এত জীব চলে পথে চলিবার স্থান
কষ্টে অতি মিলে নরে ; চলিল পথির পরে
জটিল জনতা ঠেলি শতপদ যেন ফেলি
শতপদ বক্ষে চলি করয়ে প্রয়াণ।

দেহের উত্তাপে তারে জানি জীবকুল,
ভগ্ন ক্ষীণ ক্ষুণ্ণ স্বর, পল্লবে যেন মর্মর
নির্গত নিশ্বাসপথে—ব্যথায় ব্যাকুল,

কহিল—"শরীরী প্রাণী স্থূল দেহ তব,
তুমি কেন হেথা নর দুরন্ত এ গুহান্তর
কোথা আদি কোথা অন্ত না পাইবে সে তদন্ত
এ গুহা-গহ্বর, নর-দুর্গম ভৈরব ;

কতকাল (ই) আছি হেথা ভ্রমি এইভাবে
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া শ্রান্ত তবু পদে-পদে ভ্রান্ত
চিনিবারে নারি পথ—তুমি কোথা পাবে?

আলোকে ভ্রমণ সদা অভ্যাস তোমার,
ওহে দেহধারী নর শীঘ্র ত্যজ এ-গহ্বর

আত্মাময় দেহ ধরি আমরা ভ্রমণ করি
আমাদেরি নেত্রপথে নিশি এ আঁধার!

নিবারি ফিরিয়া যাও।"—তখন শরীরী
কহিল "হে আত্মাময়, তব চক্ষে দৃশ্য নয়
আমি কিন্তু যাব এই অন্ধকার চিরি,

সঙ্গে হের কে আমার।"—বলিয়া সংকেতে
দেখাইল জ্যোতির্ময়ী, নিরখি সবে বিস্ময়ী
শশব্যস্ত আথান্তর বদনে বিস্তারি কর
পলায় পাপাত্মগণ নিশি যথা প্রাতে ;

কিংবা পিপীলিকা-শ্রেণী দলিলে চরণে
চৌদিকে যেরূপে ধায় সেইরূপে হেরি তায়
পলাইল পাতকীরা সে কুহা-গহনে।

প্রবেশে গহ্বরমধ্যে অমরী পশ্চাতে
শরীরী পরানী এবে চলে ধীরে ভেবে-ভেবে
কাতর অন্তরে অতি ভয়ে-ভয়ে করে গতি
দেখে জ্বলে গুহালোক—দীপ যথা বাতে।

না যাইতে বহুদূর শরীরী হেরিল
বদনে গুণ্ঠনাবৃত আত্মা-দেহী শত-শত
চলে ধীরে, কভু দ্রুত, কখনো শিথিল ;

চলে পথে, চলনের গতি চমৎকার—
যষ্টি বাড়াইয়া ধীরে পদ ফেলি দেখে-ফিরে
এই চলে একধারে মুহূর্তে অপর পারে
ক্ষণে পূর্ব, ক্ষণে পরে পশ্চিমে আবার।

শরীর-গুণ্ঠনে ছাপ কত রঙে আঁকা ;
কী যেন কক্ষের তলে লুকায়ে সতর্কে চলে
খঞ্জ গতি—কক্ষে যেন বিন্ধিছে শলাকা।

আচ্ছাদন অবয়ব ভাষা বর্ণ বেশ
দেখিল যত প্রকার বিভিন্ন সে সবাকার
দেখিয়া ভাবিল দেহী ধরা বুঝি শূন্য-গেহী—
এত জাতি এত জীব ভুঞ্জে সেথা ক্লেশ।

নিকটে আসিবামাত্র মিষ্ট আলাপন
মৃদু সম্ভাষণ করি দ্রুত গতি অগ্রসরি
দাঁড়াইল হাস্যমুখে শত-শত জন।

এত মধুপর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই—
যেন বা মিত্রতা কত　　স্নেহ-মায়া পূর্বগত
স্মরি যেন হৃদিতল　　কতই সুখ-বিহ্বল
তত আপনার আর কেহ যেন নাই।

চাহি অমরীর মুখ মানব তখন—
"হে দিব্যাঙ্গি! কহ এ কী নেত্রে না কখনো দেখি
জনপ্রাণী ইহাদের, তবে কী কারণ

এরূপে সম্ভাষে সবে?"—জ্যোতির্ময়ী বলে,
"ও কথা শুনো না কানে　　চেয়ো না ওদের পানে
ওরা জীব নরাধম!"　　বলিয়া ঘুচাতে ভ্রম
মুখের গুণ্ঠন তুলি দেখায় সকলে ;

নরদেহী চমৎকৃত ত্রাসি অন্তরে,
সবারি ললাটভাগে　　দেখিল অঙ্কিত দাগে—
'প্রতারক'—লেখা দগ্ধ-শলাকা অক্ষরে।

তখনি জীবাত্মাগণ কাঁপিতে-কাঁপিতে
ঊর্ধ্বপদে নিম্নশিরে　　ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ফিরে
করে ঘোর আর্তনাদ　　না পারে ফেলিতে পাদ
রুদ্ধশ্বাসে উড়ে যেন না পারে থামিতে—

মুখে বলে—"হায়-হায় ধরায় তখন
কেন বা চাতুরী করি　　পরের সর্বস্ব হরি
যাপিয়া জীবনকাল—ভুঞ্জি এ যাতন।"

রোষ-কষায়িত-নেত্রে অধর সৃক্কণে
ঘৃণাভাব বিলেপিত　　অমরী চলে ত্বরিত
মানব-দেহীরে লয়ে!　　পশ্চাতে বিস্মিত হয়ে
শরীরী চলিল ধীরে সে কুহা-গহনে।

চলিল—বধির কর্ণ আত্মা-কোলাহলে,
কেহ নাহি শুনে কায়,　　সম্ভাষে সবে সবায়
বিকলিত কতরূপ অস্ফুট কাকলে।

চলেছে সে আত্মাগণ নিরানন্দ মন,
চলিতে-চলিতে হায়,　　অদ্ভুত ভীম প্রথায়
ছিন্ন গ্রীবাসহ তুণ্ড　　অন্য কাঁধে বসে মুণ্ড
কার মুখে কার জিহ্বা ভীষণ দর্শন!

অন্ত নাই—শান্তি নাই—গতি অবিচ্ছেদ
মাঝে-মাঝে ঘোরতর　　মুখে বেদনার স্বর
নীশাচর প্রেত-প্রায় তম করে ভেদ।

জিজ্ঞাসে অমরী চাহি দেহধারী প্রাণী
"কী কারণে আর্তনাদ করে এরা—কী বিষাদ
কী তাপে অন্তর দাহে কেন বা ওরূপে চাহে
বনভ্রষ্ট যুথ হেন হেরে অরণ্যানী?"

কহিলা অমরীমূর্তি—"করিছে ভ্রমণ
এইসব জীব হেথা কতকাল এই প্রথা
এই কথা মনে যবে করয়ে স্মরণ,

যখনি হৃদয়তলে প্রবেশে প্রত্যয়—
না পাবে উদ্দেশ্য স্থান না পাবে পথ-সন্ধান
ছায়ারূপে দূরে খালি হইবে চক্ষের বালি
প্রকাশে তখনি স্বরে নিরাশের ভয়।

দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিৎ
কী দুঃসহ সে যাতনা, কী নিরাশা সে কল্পনা
বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত।

মিথ্যুক পাপাত্মা এরা—ধরাতে থাকিয়া
জড়ায়ে অসত্য-জাল কাটিলা জীবনকাল
এবে ভুঞ্জে ফল তার, এখনও চিত্তবিকার ;
দ্বিধানলে জ্বলে নিত্য এখানে আসিয়া।

চলো আগে"—বলি দেবী হয়ে অগ্রসর,
দাঁড়াইলা একস্থানে ; শরীরী উৎসুক প্রাণে
পুনর্বার চারিদিকে চাহিল সত্বর।

দেখিল সম্মুখে এক ভীমাকার বন,
ঘনতর কুয়াসায় আবৃত সে বনকায়
দেখিল জঠরে তার করিছে ভ্রমণ।

কত জীব-দেহছায়া কতরূপ ধরি,
কদলীপত্রের প্রায়, সতত কম্পিত হায়,
ভীত-দৃষ্টি মন ক্লেশে হেরে সদা পৃষ্ঠদেশে—
পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটে দণ্ড ধরি ;

সে বনের চতুর্দিকে বিকট নিনাদ
উঠে নিত্য ঘোরোচ্ছ্বাসে আত্মাকুল মহাত্রাসে
করে ঢাকি শ্রুতিতল করে আর্তনাদ।

বিকট বিদ্যুৎছটা মাঝে-মাঝে তায়
পড়ে অরণ্যের গায়, আত্মাকুল-দগ্ধপ্রায়

হা হতোহস্মি শব্দ করি   বৃক্ষ-বিবরেতে সরি
লতাগুল্ম অন্ধকারে আতঙ্কে লুকায়।

সেখানেও নাহি শ্রান্তি যাতনা-সন্ত্রাসে ;
বিবর-কোটর-গায়   যেখানে লুকাতে যায়
সেইখানে গন্ধকীট উড়ে চারিপাশে,

কর্ণমূল গণ্ডদেশে কটুল ঝংকারে,
ভ্রমে সদা লক্ষ-লক্ষ,   ছড়ায়ে বিষাক্ত পক্ষ,
উড়ে-উড়ে চারিধারে   আকুল করে ঝংকারে,
ব্যথিত জীবাত্মাকুল দংশন-প্রহারে!

দেখে নর আত্মা-দেহ সে বন-ভিতরে
কত হেন গিরি-কূটে,   নদী, গুহা, লতাপুটে
কাঁদিতে-কাঁদিতে কাঁপে বিবরে-বিবরে।

বিবর ছাড়িতে নারে বিদ্যুতের ভয়ে,
ভিতরে দুর্গন্ধময়   কর্ণমূলে কৃমিচয়
ঝংকারে বিষণ্ণ তানে   বধির করিয়া কানে
অধীর জীবাত্মাকুল বিবর-আশ্রয়ে।

হেন অন্ধকার দেশ যেন নেত্র-পথে
গুরুতর কোনো ভার   দৃষ্টি রোধে অনিবার
না সরে, না হয় ভেদ, কভু কোনো মতে!

কত আত্মা সে দুঃসহ তিমির-পীড়নে
করি ঘোর আর্তধ্বনি   বিদ্যুতাভা শ্রেয়ঃ গণি
বিবর ছাড়িতে চায়   ছাড়িতে না পারে তায়,
এবে তমসায় অন্ধ দৃষ্টির বিহনে!

দেহধারী মানবেরে অমরী সম্ভাষে—
"নিরানন্দ এইসব   জীববৃন্দ হে মানব,
দেখিছ এখানে যত ভীত হেন ত্রাসে :

কূটজীবী প্রবঞ্চক যতেক দুর্মতি,
ধরাতলে বঞ্চনায়   ছলিলা কত প্রথায়
আপন হিতের তরে   সতত পরস্ব হরে
হের হে সে পাপীদের হেথা কিবা গতি!

হের কী দুর্গতি কিবা বিশীর্ণ মুরতি!
জীবনে দুষ্কৃতি যত   আগে ছিল স্মৃতিগত
এবে কীটরূপ শত বধিরিছে শ্রুতি।

না পারে সহিতে পূর্ণ আলোকের ছটা,
কিরণ দেখিলে কাঁপে   নিত্য দহে চিত্ত-তাপে
অদেহী-চিত্তের দাহ—   দুরন্ত বিষ-প্রবাহ
ছুটিছে অন্তর-তটে করি ঘোর ঘটা।

দেখ দেহী ওই স্থান"—বলিয়া আবার
অমরী দেখায়ে তায়   সেইদিকে ধীরে যায়
দেহধারী নিরখিল সংকেতে তাঁহার।

দেখিল মরু-প্রান্তরে জীবাত্মা ছুটিছে
পতঙ্গপালের মতো   মধ্যস্থলে কূপগত
কত জীবাত্মার রাশি   খেদবাণী পরকাশি
কূপগর্ভে নিরন্তর অনলে পুড়িছে।

কূপের নিকটে তবে অমরী আসিয়া
দেখাইল মানবেরে,   স্তম্ভিত শরীরী হেরে
অনলের হ্রদে জীব চলেছে ভাসিয়া ;

ক্ষুদ্রমুখ, কূপগর্ভ বিশাল ব্যাদান,
লক্ষ লক্ষ অহি তায়   অনল মাখিয়া গায়
লোল জিহ্বা প্রসারিয়া   লেহিছে জীবাত্মা-হিয়া
নাচিয়া প্রমথগণ করিছে সন্ধান।

বিকট কার্মুক ধরি তীক্ষ্ণতর শর
কূপগর্ভে নিরন্তর   আত্মাকুল জরজর—
শরজ্বালা অহিদন্ত-দংশনে কাতর!

যখন অস্থির সবে তীব্র বেদনায়
অন্ধকারে দৃষ্টি করি   কূপ-পার্শ্বে ধরি-ধরি
ঊর্ধ্বেতে উঠিতে যায়   তখনি সে-সবাকায়
ভূতগণ শর ক্ষেপি গহ্বরে ফেলায়।

ছায়ারূপী কত আত্মা সে প্রান্তরময়
শীর্ণ-ক্লিষ্ট হৃতশ্বাস   হৃদয়ে হত বিশ্বাস—
কাহার কথায় কেহ না করে প্রত্যয়।

জননী বিশ্বাসী নয় আপন তনয়ে!
পুত্র না প্রত্যয় যায়   পিতা দ্বিধে তনয়ায়
অবিশ্বাসী পতি-প্রিয়া   অবিশ্বাসে দগ্ধ হিয়া
মিত্রে না পরশে মিত্র প্রতারণা-ভয়ে!

আত্মাকুল এইভাবে ভ্রমে সে কান্তারে ;
শ্রান্ত হয়ে কভু ধায়,   লভিতে তরু-আশ্রয়—
পল্লব-শোভিত তরু কান্তারের ধারে।

তরুতলে আসে যেই, তুলিয়া মর্মর
হেন বিষাদের স্বর ধরে লতা-পত্র-থর
যেন বা উন্মত্ত বেশ কেহ তরুমূল-দেশ
কেহ শাখা-পত্র ছিঁড়ে অধৈর্য কাতর।

তখন সে পত্রদল বৃশ্চিক-আকারে
শূন্য হতে নিত্য ঝরে জীব-আত্মা দেহ পরে
বিষাক্ত দংশনে দগ্ধ করয়ে সবারে।

পলায় জীবাত্মাবৃন্দ উধাও হইয়া,
বদন বিকৃতাকার নিকটে না আসে আর
ভ্রমে তমোময় পথে অপূরিত মনোরথে
গহ্বরের কুহেলিতে অদৃশ্য থাকিয়া।

অমরী শরীরী চাহি কহিলা—"হে দেহী
এই দ্রুম বিষগর্ভ ; শাখা, শিখা, পত্র-পর্ব
তীব্র বিষপূর্ণ—গন্ধে নাহি জীয়ে কেহ।

ধরাতে 'উপাস' নামে এ তরু আখ্যাত
যে যায় ইহার তলে যে পরশে পত্রদলে
যে শরীরে পড়ে ছায়া তখনি সে জীর্ণ কায়া
নির্ঘাত জীবন-মূলে তখনি আঘাত।"

হেরিলা ধরিত্রীবাসী সে গাঢ় কুয়াসা,
গহ্বর আচ্ছন্ন যায় দুরন্ত প্রভা-ছটায়,
কখনো উড়িয়া যায়—দিশি পরকাশা।

তখন গহ্বরগত জীবাত্মা-মণ্ডলী
ভোগে যে দুর্গতি কত দেখিলে হৃদয় হত
পড়ি জড়রাশিপ্রায় প্রান্তর অরণ্যছায়,
নত গ্রীবা ভুজতলে করিয়া কুণ্ডলী।

না পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্য কারে,
জড়ীভূত জীর্ণ কায়া সেইসব জীব-ছায়া
নিশ্চল—নির্বাক—যেন ভুজঙ্গ তুষারে।

যমদূত ভয়ংকর আসিয়া তখন
প্রত্যেক কুণ্ডলীকৃত পাপাত্মারে করি ধৃত
তীব্রালোক তুলি মুখ, খুলিয়া দেখায় বুক—
হেরিয়া শরীরী ভয়ে পাণ্ডুর বরণ।

স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রায় হৃদয়ের তল,
দেখা যায় সে কিরণে— লেপিত যেন অঞ্জনে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ছিদ্র-পূর্ণ ক্ষতস্থল।

আপনি ফুলিছে কভু আপনি ফাটিছে
সেইসব ছিদ্রমুখ ছিন্নভিন্ন করি বুক,
ক্ষত-স্রাব মাখি গায় কোটি কৃমি ভ্রমি তায়
ছিদ্রে-ছিদ্রে ছুটে-ছুটে কলিজা কাটিছে!

কত ভীতিপূর্ণ স্থান হেরিলা শরীরী
গাঢ় কুজ্ঝটিকাময় সে ঘোর পাপী-আলয়
অমরীর সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে-ভয়ে ফিরি।

ভ্রমিতে লাগিলা দেবী দেখায়ে নরেরে
ধরাতলে খ্যাতিমান কত মিথ্যুকের প্রাণ—
প্রতারক ছদ্মভাষী বকধর্মী আত্মারাশি—
এখন নিরুদ্ধ সেই গহ্বরের ঘেরে।

দেখাইলা মানবেরে অমরী সেথায়,
বৃক্ষ-বিবরেতে স্থান বসি কোনো নরপ্রাণ,
রুদ্ধ-কণ্ঠ গতশ্বাস টানিছে জিহ্বায়।

বসিয়া "তৈথস ওঠ" বিকট বদন ;
গন্ধকীট অবিরত উড়িয়া পড়িছে কত
চক্ষু-মুখ-নাসিকায়, তাড়াইতে সে সবায়
অজস্র অশ্রুর ধারা ঝরিছে নয়ন!

শূন্য হতে অনিবার ক্ষিপ্ত ভস্মরাশি
উত্তপ্ত কঙ্করবৎ রোধি নাসা-ওষ্ঠপথ
ব্রাহ্মতালু-তল-দগ্ধ ক্ষার-ভস্ম গ্রাসি!

করে করতল ঘাতি প্রেতরূপধারী
চারিদিক ঘেরি তার, ছাড়ি ঘোর হুংকার,
শব্দে বিদারিছে প্রাণ বদ্ধমূল নিরুত্থান
মৌনীভাবে কাঁদে জীব উরসে প্রহারি!

হেরিল অমরীবাক্যে অন্যত্রে চাহিয়া,
বদনে জড়ানো কর "এন্টনি" বিষণ্নস্বর
"কাইসরের" মৃত তনু সম্মুখে পড়িয়া,

বদনে বিলাপ ক্ষরে হৃদি বিদারিয়া ;
সে প্রাণী কাছে তখনি, আসিয়া শুনিল ধ্বনি
শুনিল এ নহে তাহা "সপ্ত গিরি রোমে" যাহা
কপটী শুনায়েছিল জগৎ মোহিয়া।

অন্যদিকে হেরে ফিরে গহ্বর-ভিতরে
ললাটে গভীর রেখা ঘুরিছে জীবাত্মা একা
ঘোরে যথা অন্ধ-বৃষ তৈলচক্র ধরে।

ভ্রমে জীব শলাবিদ্ধ নয়নে-নেহারি,
পৃষ্ঠরেখা বক্রভাব ওষ্ঠাধরে লালাস্রাব
সম্মুখেতে শিলাতলে রেখাঙ্কিত অশ্রুজলে
ব্যসনের পাষ্টী ঘুঁটি পড়েছে প্রসারি।

শরীরী জিজ্ঞাসে—"কার আত্মা এ পরানী?"
অমরী কহিলা তায় কটাক্ষ কূট প্রভায়
"ভারত-কলঙ্ক অই কুটিল শকুনি।"

বলিয়া নির্দেশ কৈলা হেলায়ে অঙ্গুলী,
শরীরী ফিরিয়া আঁখি সেইদিকে দৃষ্টি রাখি
হেরে এক কৃষ্ণাসন ক্লেদ-পূর্ণ কুগঠন,
শৈলের অঙ্গেতে গাঁথা—শূন্যে কেতু তুলি।

'এখন আসন শূন্য' অমরী কহিলা,
"কিন্তু ওই শিলাখণ্ডে বিধির বিহিত দণ্ডে
সত্যরূপী যুধিষ্ঠির সন্তাপ ভুঞ্জিলা ;

একমাত্র মিথ্যাবাণী বলিয়া জীবনে—
সেই পাপে এ আলয়ে মনস্তাপে দগ্ধ হয়ে
কুন্তীপুত্র ধর্মধর দ্বাপরে প্রসিদ্ধ নর
সে পাপ খণ্ডিলা আসি এ তাপ-ভুবনে।

তার চিহ্নহেতু এই শিলার আসন
চিরন্তন বদ্ধ হেথা অলঙ্ঘ্য নিয়ম-প্রথা
জানাইতে শৈল-অঙ্গে কেতু নিদর্শন।

দেখো, দেহী, কত আত্মা সন্ত্রাসিত এবে
কাঁদিছে ওখানে বসি নেত্রমণি গেছে খসি
মুখে শব্দ হাহাকার শ্রবণে কীট-ঝংকার
জীবনে অসত্য খল ছলনায় সেবে।

পরিহরি সে প্রদেশ চলিলা দক্ষিণে ;
অকস্মাৎ কোলাহল যেন চলে স্রোত-জল
চতুর্দিক হতে সেথা প্রবেশে শ্রবণে।

এত অন্ধতম কুহা সে দুর্গম স্থানে ;
কোথা হতে কোলাহল কোথা বা আত্মাসকল
কিছু নাহি দৃশ্য হয়, খালি ভীতি-শব্দময়
কলরব ভয়ংকর প্রবেশিছে কানে।

সেখানে পশিতে নর দেখিল সভয়ে
জ্যোতির্ময়ী ক্ষণে-ক্ষণে যেন দ্বিধাযুক্ত মনে
ভাবে কোনদিকে পথ কুহা-অন্ধ হয়ে।

হেন রূপে চলে দোঁহে—শুনে অকস্মাৎ
পশ্চাৎ পারশদ্বয় উচ্চনাদে পূর্ণ হয়
যেন আত্মা কতজন অন্ধকারে অদর্শন
বলিতেছে ঘোরস্বরে বচন নির্ঘাত—

"সাবধান—সাবধান, সম্মুখে গহ্বর
অতল পাতালস্পর্শ অসীম ভীম দুর্ধর্ষ
কে যাও নিরস্ত হও—নহিলে সত্বর

পড়িয়া প্রপাত-মুখে ছুটিবে এখনি
সে অতল তলদেশে কে যাও শরীরী-বেশে
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও ওইখানে স্থির হও
পাদমাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তখনি।"

কপালে ঘর্মের বিন্দু স্তব্ধ কলেবর
শরীরী দাঁড়ায়ে সেথা নেহারে অপূর্ব প্রথা
দুরন্ত প্রপাত ছোটে শব্দ-ভয়ংকর।

নেহারি পাতালদেশে দেহীর পরান
আকুল হইল ভয়ে যেন মৃগীগ্রস্ত হয়ে
হেরে ঘুরে শূন্যদিক নেত্র-পাতা অনিমিষ
পড়ে-পড়ে যেন স্রোতে হারাইয়া জ্ঞান!

দেখিয়া অমরী নরে ধরিল তখনি,
মুহূর্তে দিলা চেতন শরীরী বিহ্বল মন
কহিলা "না থাক হেথা হে দেবনন্দিনী,

অন্য কোথা লয়ে চলো—দেখো দেহে চাহি।"
অমরী ভাবিয়া দুঃখ হেরে লোমকূপ-মুখ
কণ্টকে আচ্ছন্ন যেন পুলকিত দেহ হেন
কহিলা আশ্বাসি নরে প্রয়োজন নাহি

প্রবেশি এ দুর্গমেতে—ও গুহা গর্হিত,
বিধির বিধান-বলে, আত্মাকুল-অশ্রুজলে
পরিপূর্ণ চিরকাল—নিত্য উচ্ছ্বাসিত।

বিষম দুঃখের ভাগী বিশ্বাসঘাতক
মর্তলোকে যতজন, মিত্রঘাতী ক্রূর মন—
ওই পাতালের তলে চলো যাই অন্যস্থলে
নিরখিতে অন্যরূপ পাপের নরক।

অমরী মানবে লয়ে নামিল তখন ;
জগতের কেন্দ্র ছাড়ি শূন্যমাঝে দিয়া পাড়ি
ভিন্নরূপ পাপলোকে করিলা গমন।

আকাশের যেই খণ্ডে অট্টালিকাকার
পঞ্চ নক্ষত্রের মিল শোভি গগনের নীল,
দশমী তিথিতে যেথা চন্দ্রের বিহার ;

পাঁচে একে-একে পাঁচ—মিলায়ে কিরণ,
নিশীথিনী শিরোপরে সুচিকন ঝারা ধরে
অনন্ত কোলেতে যাহা দেয় দরশন ;

মঘা নামে তারালোক—প্রবেশি তাহায়
নরে নামাইলা দেবী ; সুশীতল বায়ু সেবি
সে-লোক বাহিরে দেহী শরীর জুড়ায়।

শীতল হইলে পরে অমরী মানব
প্রবেশিল গর্ভতলে, দণ্ড দুই কাল চলে,
গোধূলি আলোকে যেন—বিমর্ষ নীরব।

কিছু পরে হেরে দূরে উন্নত প্রাচীর,
হেরে মনে হয় হেন, লৌহের প্রাকার যেন
নীরব শূন্যের কোলে তুলেছে শরীর ;

নিবারিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়,
ঘোর প্রহরীর বেশে, বিরাজিছে ঘোর দেশে
কালির বরণ অঙ্গ কালের মলায়।

দুইদিকে দুই দ্বার—প্রশস্ত ভীষণ,
কৃষ্ণ-মূর্তি ভয়ংকর শত শমনের চর
রোধি প্রবেশের দ্বার করিছে ভ্রমণ।

পশিছে তাহাতে যত আত্মাময় প্রাণী
কৃষ্ণবর্ণ লৌহশলা তপ্ততৈলে যেন জ্বালা,
অঙ্গে বিঁধি তাহাদের কহে ঘোর বাণী।

জ্যোতির্ময়ী চলে আগে—পিছে-পিছে নর,
আসিয়া দ্বারের কাছে প্রবেশের পথ যাচে
কৌতুকে নিকটে ছুটে যত যমচর।

অপূর্ব মধুর বাণী অমরী-বদনে
শ্রবণে হয় শীতল, কৃতান্ত-কিঙ্করদল
চমকিত-চিত্তে চাহে দেবীর নয়নে।

স্বর্গ-শোভাকর আভা চারু নেত্রতলে
ধীর স্নিগ্ধ মনোহর নেহারি শমনচর
পথ ছাড়ি দুইধারে দাঁড়ায়ে সকলে।

ভিতরে প্রবেশি নর নিরখে আকাশে
নিবিড় জলদদল বিন্দুমাত্র নাহি জল
গর্জিয়া-গর্জিয়া খালি উড়ে-উড়ে ভাসে।

নিদাঘে রৌদ্রের তাপে ফাটিলে যেমন
অবনীতে ক্ষেত্রক্ষয় সেইরূপ নেত্রময়
চারিদিক রুক্ষবেশ—নীরস-দর্শন।

হেন রুক্ষ ক্ষেত্রতলে পশিলা দুজনে ;
ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তরুসারি হেরিলা শাখা প্রসারি
পিপাসাতে ফাটি যেন চাহিছে গগনে।

হেরিলা কতই লতা-ক্ষুপ সে কান্তারে
শুষ্ক শাখা শীর্ণ মাথা বিনা বাতে ঝরে পাতা
আপনা হইতে নিত্য শোণিত উগারে!

দূর হতে লক্ষ করি তরু সে সকল
বিস্ফারিত ছিলা পর বসায়ে সুতীক্ষ্ণ স্বর,
ভ্রমে কত তমচারী দলি-দলি ক্ষেত্রতল ;

অর্ধ-দেহ নরাকৃতি—কটির উপরে,
পদপুচ্ছ অশ্ব-প্রায় ঝড়ের গতিতে ধায়
লতা-গুল্ম-ক্ষুপ-তরু বিদ্ধ করে শরে।

ক্ষত অঙ্গ সে সকল বিষাদে তখন
মনুষ্য-ক্রন্দন-স্বরে ফুটিয়া নিনাদ করে,
শর-সঙ্গে শুষ্ক ত্বক ঝরে যতক্ষণ।

স্থানে-স্থানে যমদূত প্রান্তর খুঁড়িয়া
বেড়ায় বিকট আঁখি আঁধারে বদন ঢাকি
অঙ্গার-সদৃশ করে খনিত্র ধরিয়া।

অমরীর দিকে নর ব্যগ্রচিত্তে চায়,
ধীর সম্বোধনে তাঁয় কহে—"দেবী, কী হেথায়
কারা এরা হেন বেশে কাঁদে এ প্রথায়?

কেন বা কালের চর ওরূপে খনন
করিছে এসব ক্ষেত্র?" অমরী প্রশান্ত-নেত্র
চাহি মানবের দিকে কহিলা তখন—

"গুপ্ত কামে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা-প্রবাহ
বহে হৃদয়ের তটে সংঘটন নাহি ঘটে
এসব তাদেরি আত্মা—সহে পাপ-দাহ।

মৃত্যুচর হের যত করিছে ভ্রমণ,
ফুটাতে অঙ্কুর বীজে যে যাহার নিজে-নিজে
খুঁড়িছে ক্ষেত্রের তল—করহ শ্রবণ—

প্রোথিত এ ক্ষেত্রতলে প্রাণী-আত্মা কত
পোড়ে নিত্য তাপানলে, অলৌকিক বিধি-বলে
অঙ্কুরিত হয় পরে লতা-গুল্মমতো।

ক্ষুদ্র কীট পদতলে ভ্রমিলে যেমন
সর্বাঙ্গে লোমাঞ্চ হয় মানবের দেহময়
সহসা তেমতি হয়, শুনে সে বচন ;

শরীরী সে স্থান ছাড়ি অন্তরে দাঁড়ায়।
অমরী মধুরতর বাক্যে কহে—"ভ্রান্ত নর,
সর্বঠাঁই এইরূপ, সরিবে কোথায়?

"যাই হোক অন্য স্থানে চলো, দেবী, চলো,"
মানব কহিলা তায়, দ্রুতপদে দুজনায়
সে ক্ষেত্র ছাড়িয়া পশে অন্য ক্ষেত্রতলে।

"এইদিকে হে শরীরী," অমরী কহিলা,
"দেখো চাহি ক্ষণকাল, দুঃখ ভোগে কী বিশাল
পঙ্কিল-পরান যত অসতী মহিলা।"

অমরীর বাক্যে নর হেরে অনিমিষে ;
দেখিল পল্লবহীন কত শুষ্ক তরু ক্ষীণ
শাখা তুলি শূন্যতলে উঠেছে চৌদিকে।

কহিল—"কোথায় দেবী, না দেখি তো কই
কোনো এক আত্মা-চিহ্ন শুষ্ক জীর্ণ তরু ভিন্ন
অন্যকিছু কোনো স্থানে বিদিত না হই।"

"নিরখিয়া দেখো নর—হও অগ্রসর,
তবে এর তথ্য পাবে" বলিয়া ত্বরিতভাবে
বৃক্ষ-সন্নিধানে দেবী আইলা সত্বর।

দেখিলা শরীরী সেথা—শশ্মানে যেমন
চিতাধূমে সমাচ্ছন্ন চিতাতাপে দগ্ধবর্ণ
শাল্মলী-খর্জুর-তাল—তেমতি দর্শন।

শুষ্ক বৃক্ষ স্থানে-স্থানে পত্রশূন্য শির,
গৃধ্রকুল শাখাদেশে বসেছে করালবেশে
পক্ষীর পুরীষে বৃক্ষ কদর্য-শরীর।

নখে-নখে বিন্ধি শাখা বসি গৃধ্রদল
চিবাইছে ধীরে-ধীরে চঞ্চু দিয়া চিরে-চিরে
স্কন্ধ শাখা শুষিতেছে ঘর্ষি গলতল।

পড়িছে অজস্র বেগে শত-শত ধারা—
রুধিরের ধারা হেন কাঁপি-কাঁপি বৃক্ষ যেন
বিশীর্ণ সংকীর্ণ ক্রমে অন্তঃসার হারা।

তখন সেসব তরু করিয়া ক্রন্দন
ফাটিছে দ্বিখণ্ড হয়ে হেরিয়া শূন্যেতে রয়ে
দ্বিফল-শূলের ভাব করিছে ধারণ।

তাপিতের ঘোর স্বর বদনে সবার
আত্মাগণ একে-একে জীবময় বৃক্ষ থেকে
বাহিরি প্রকাশে দুঃখ চিত্তে যেবা যার।

অমরী কহিলা—"নর, গৃধ্র হের যত
এ হেন কদর্য-বেশে বসি উচ্চ শাখাদেশে
পক্ষী নহে ও সকল—পক্ষীরূপগত

শমনের ভীমচর রাক্ষস উহারা!"
ত্রস্ত হয়ে চাহে নর গৃধ্ররূপী নিশাচর
সঘনে চিৎকার ছাড়ি উন্মত্ত তাহারা,

পাখার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে
চঞ্চুতে প্রহার করি ক্ষুরধার নখে ধরি
বিদীর্ণ বৃক্ষের মাঝে ফেলে আত্মাগণে।

অমনি দ্বিখণ্ড তরু দাঁড়ায়ে আবার
উঠিয়া পূর্বের মতো জীববৃন্দ তরুগত
নিদারুণ নিপীড়ন সহে পুনর্বার ;

সে সবার মাঝে নর হেরে দুইজন,
অশ্রুদগ্ধ গণ্ডতল জীর্ণ-শীর্ণ বক্ষঃস্থল
ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে কাতর বচন—

'হে বিধাতঃ কেন আর—মরণ কোথায়?
এ পরানে নাহি কাজ ধরাও গৃধ্রের সাজ
দাও মরিবারে পুনঃ অহো প্রাণ যায়!

মানব জিজ্ঞাসে—"দেবী, দেহ যেন মসী
কপোলে অশ্রুর ধারা নারীবেশে কে উহারা
আত্মা হেরে মনে হয় আছিল রূপসী—

ছিল যবে ধরাতলে ; প্রাচীনা যেজন
পরিচিত কিবা নামে? কে ওটি উহার বামে
সুরূপা নবীনা বালা—মলিনা এখন?"

"জিজ্ঞাসো নিকটে গিয়া"—বলিয়া অমরী
তাদের নিকটে যায় ধীরগতি পায়-পায়
ভাবিয়া চলিল নর গ্রীবা নত করি।

নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাল
পক্ষ সাপটিয়া সবে ভয়ংকর তীক্ষ্ণ রবে
তুলিল এমনি ঝড় প্রচণ্ড করাল,

অমরী মানব দোঁহে যেন অকস্মাৎ
পক্ষ-ঝাপটের জোরে পড়ে ঘূর্ণবায়ু-ঘোরে ;
সংকট বুঝিয়া দেবী উর্ধ্বে তুলি হাত

বলিলা—"হে ধর্মচর, ক্ষান্ত দাও রোষে,
আমরা পাপাত্মা নহি বিধাতার বিধি বহি
পশেছি এ পাপদেশে—নহে অন্য দোষে।"

ঝংকার পাখার নাদ নীরব তখনি ;
গিয়া দুই আত্মা-পাশে, মানব কম্পিত ত্রাসে
সুধাইল দুইজনে, শ্রবণে সে ধ্বনি,

উচ্ছ্বাসি গভীর শ্বাস প্রাচীনা যেজন
কহিলা—"হে দেহধর, শাপযুক্ত আমি, নর,
দেব-গুরু-ভার্যা আমি—পাপেতে এমন ;

কামীর নরক-মাঝে হের হে তারায়।"
বলিয়া যুগল করে বদন ঢাকিলা পরে
বৃক্ষ-কারাগারে ছোটে শিহরি লজ্জায়।

জীবময় অন্য প্রাণী বলিলা বিষাদে—
"আমি নর, পাপীয়সী অশুচি প্রণয়ে পশি
এ ভোগ ভুগি হে হেথা চির-অনাহ্লাদে ;

আমি বিদ্যা ভারতের!" বলিয়া লুটায়
শরাহত মৃগীপ্রায়। নরদেহী বেদনায়
অমরী-সহিত ফিরে অন্যদিকে যায়।

না চলিতে বহুপথ শিহরে মানব,
দেখিল সম্মুখে তার   গলে ভুজঙ্গের হার,
ছুটিছে জীবাত্মা এক নিনাদি ভৈরব।

হৃদিতল ফুঁড়ি-ফুঁড়ি দংশিছে ফণিনী,
হৃদিতলে ধারা ঝরে   সর্প ধরি ডানি করে
টানিতে-টানিতে ফণী ছুটেছে রমণী।

"কে তুমি"—জিজ্ঞাসে নর ভয়ে চমকিত,
"উন্মাদিনীপ্রায় হেন   অজ্ঞানে ছুটিল কেন?
কহ শুনি কী পাতকে এখানে প্রেরিত?"

স্তম্ভিত নরের বাক্যে—দাঁড়ায়ে সম্মুখে
সে জীবাত্মা জড়বৎ   নিবারিতে হেরি পথ
কহিতে লাগিল বাণী নিদারুণ দুখে—

"সুধায়ো না হে শরীরী, সে কথা আমায়,
মিশর-রাজ্ঞীরে হায়   কে না জানে বসুধায়
কুলটার ঘোর তাপ এখন হেথায়!

চলো নিরখিবে কিবা যাতনা দুঃসহ
ভুগি প্রাণে অনুক্ষণ   কুলটার কী শাসন
দেখিবে চলো হে চক্ষে দুঃখ বিষবহ।"

"কে ইনি"—বলিয়া ক্ষান্ত হইল তখনি ;
চাহি অমরীর মুখে   দারুণ মনের দুখে
নতশির অধোমুখে দাঁড়ায় রমণী।

ধীর-শান্ত-সুশীতল দেবীর বচন
ঝরিল পীযূষতুল্য   সে পীযূষ কী অমূল্য
পঙ্কিল পরান যার জানে সেইজন।

"যাও আগে ; হে জীবাত্মা, দেখাও মানবে",
অমরী বলিলা তায়,   "ব্যভিচার-পিপাসায়
কীরূপে নিবারে যম—দেখাও সে সবে।"

নীরবে চলিলা এবে ত্রিবিধ পরানী—
দেব-আত্মা দেহী নর   পাপিনী নরকচর—
আগে চলে সকলের মিশরের রানী।

এড়ায়ে সে তারকার কঠোর প্রাঙ্গণ
যেথা অন্য তারাতলে   কৃষ্ণবর্ণ বালু জ্বলে
সেই বালুসাগরেতে চলে তিনজন।

দেখে নর ভয়ে কাঁপি—উচ্চ শলাকায়
শত-শত প্রাণী-প্রাণ   অধঃশিরে লম্বমান
পদাঙ্গুষ্ঠ শলাবিদ্ধ অদ্ভুত প্রথায়!

সেসব আত্মার কাছে করাল-মুরতি
নিষ্ঠুর কালের চর   ছড়ে-ছড়ে দেহস্তর
ছিঁড়িছে হুংকার ছাড়ি প্রকাশি শকতি।

ভীষণ শ্বাপদকুল অতি কৃশোদর,
ক্ষুধাতে আতুর যেন   ব্যাদান বিস্তারি হেন
গ্রাসে গ্রাস খণ্ড করি টানে নিরন্তর

সেসব আত্মার দেহ। হেরি চাহে নর
অমরীর মুখপানে ;   দয়া-বিচলিত প্রাণে
অমরী ত্বরিত নরে কৈলা স্থানান্তর।

না যাইতে বহু দূরে সে দেশ হইতে
অমরীর শ্রুতি ভরে   কঠোর কর্কশ স্বরে
নিদারুণ শোকবাণী বহিল বায়ুতে।

কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীর্তন
শব-দেহ স্কন্ধে ধরি   হরি-হরি শব্দ করি
জ্ঞাতিবর্গ গঙ্গাতীরে আগত যখন।

সেইরূপ শোকময় কঠোর নিনাদ,
সহসা দক্ষিণ হতে   প্রবেশিল শ্রুতিপথে
চমকে মানব-চিত্ত শুনে সে বিষাদ।

চমকি হেরিল নর—নিরখে সম্মুখে
যেন স্তূপাকার বালি   অঙ্গেতে মাখিয়া কালি
চলেছে ঊর্মি-আঘাতে সাগরের বুকে।

নিকটে আসিলে পরে তখন নেহারে
আত্মাময় প্রাণী যত   চলেছে বালির মতো
দলে-দলে কৃষ্ণবর্ণ বালুসিন্ধু-ধারে!

উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন
সেসব আত্মার হাতে   ছিন্ন নিজ নখাঘাতে
হৃৎপিণ্ড, শিব-ঘৃত—বীভৎস দর্শন।

দলে-দলে চলে সবে—শরীরে কম্পন
যেন বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে ;   করস্থিত মুণ্ড ধরে
চৌদিকে গৃধিনীপাল করিছে খণ্ডন!

অচেতনপ্রায় জীবী নয়ন মুদিল ;
অকস্মাৎ ভীমনাদ— স্রোতে যেন ভাঙে বাঁধ
ছুটায়ে বন্যার জল—তেমতি শুনিল!

আতঙ্কে দেখিল দেহী—ঘর্মে সিক্ত ভাল—
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণদন্ত, উর্ধ্বকর্ণ
যমদূত বিতাড়িত ছোটে ফেরুপাল।

চকিতে জীবাত্মাবৃন্দ নিরখি পশ্চাতে
ছুটে বেগে উর্ধ্বশ্বাসে, নয়ন না মেলে ত্রাসে
উড়ে যেন ধূলিবৃন্দ ঝটিকা আঘাতে।

অন্যদিকে প্রাচীরের পৃষ্ঠদ্বার যেথা
বেগে প্রবেশিয়া তায় নির্গত হইতে যায়
হেরে ভয়ংকর মূর্তি দ্বারদেশে সেথা—

মহা-অজগরপ্রায় দেহের গঠন,
স্কন্ধদেশে দুই পাখা শল্কলে শরীর ঢাকা
শত কুণ্ডলেতে পুচ্ছ—রাক্ষস-বদন।

ধাবিত জীবাত্মাগণ যেই দ্বারে আসে
সেই ভীম অজগর ব্যাদানি মুখ-গহ্বর
পক্ষের ঝাপটে সবে মুহূর্তেকে গ্রাসে,

তীক্ষ্ণ দন্তে পিষি-পিষি নিক্ষেপে জঠরে।
আবার বমন করে আবার গরাসে ধরে
কখন(ও) পেষণ করে পূরিয়া উদরে।

এ হেন পীড়ন সহি প্রহরেক কাল
সেইসব পাপী-প্রাণ হতাশেতে হতজ্ঞান
প্রাচীর-ভিতরে ছুটে ভেটে ফেরুপাল।

তখন সে মহোরগ রাক্ষস-বদন,
উৎকট চিৎকার করি বলে—"রে সতীর অরি
লম্পট কুট্টনীপাল জঘন্য জীবন—

এ ভোগ তোদেরি যোগ্য ; যে বিষ ধরায়
ছড়াইলি দেহ ধরি সেই বিষ প্রাণে ভরি
ভবিষ্য-জঠরে ভোগ চির-যাতনায়!

হেরি দেহধারী নর, শুনিয়া গর্জন,
অমরীর দিকে দেখি কহিল—"জননী, এ কী
কোথায় আমারে দেবী আনিলে এখন?

এখানে কি পুণ্যময়ী দুহিতা আমার?
এ কি তার যোগ্য বাস? সে চারু কুসুমহাস
ফোটে কি এখানে কভু?—কাছে চলো তার।"

"হে দেহী তোমারি চিত্ত করিতে উজ্জ্বল,
পূরাতে তোমারি আশা এ দুঃখ-নিবাসে আসা
দেখাব কন্যারে তব, সঙ্গে ফিরে চলো।

তনয়া দেখিতে হেন ভুবনে ভ্রমণ
করিতে হবে না এবে চলো ধরাতলে নেবে
বিগত-কলুষ-তাপ বিগত-সকল-পাপ
আত্মারাম নন্দিনীর পাবে দরশন।"

এত বলি নিদ্রাগত করিয়া মানবে
চলিল অমরী ত্বরা পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাভরা
মৃদু মারুতের গতি উতরিল ভবে।

রাখি নরে ধরাতলে জাগায়ে চেতন,
পূর্ণচ্ছটা প্রতিভায় দিব্যচক্ষু দিয়া তায়
বিনয়-বিনম্র-মুখে দাঁড়ায়ে দেহী-সম্মুখে
কহিলা—"হেরো গো তব দুহিতা এখন।"

বিস্ময়ে আনন্দবেগে আপ্লুত হৃদয়
নিরখিল ধরাবাসী নির্মল শশাঙ্ক-হাসি
ধরাতলে আসি যেন হয়েছে উদয়!

মস্তকে মুকুটচ্ছটা জ্বলিছে মণ্ডলে,
সুধাগন্ধ অঙ্গে ঝরে গড়া যেন রশ্মিথরে
নয়ন নীলিমা-সিন্ধু কপালে কিরণ-বিন্দু
রেখাগত ইন্দু যেন ঈষৎ উজলে!

সন্তপ্ত-নয়নে হেরি মানব-বদন
কহিলা সুষমারাশি— "তাত, এবে অবিনাশী
আত্মাময় এ শরীর—ঘুচেছে স্বপন।

সে স্বপন এ জগতে সবারি ঘুচিবে
পাপানলে দগ্ধ হয়ে তাপানল হৃদে লয়ে
প্রক্ষালি ধরার ক্ষার খুলায়ে শমন-দ্বার
আমার মতন যবে স্বর্গেতে পশিবে!

হে তাত, দেখিতে পুনঃ হয় যদি মন
এরূপে জীবাত্মালয় অনন্ত তারকাময়
পুনর্বার দুহিতারে করিও স্মরণ।

এত বলি শোভাময়ী আকাশে মিশিয়া
ক্ষণকাল অন্তর্ধান হৈলা ছাড়ি মরস্থান,
বিস্ময়ে বিহ্বল নর নিস্তব্ধ ধরণী পর
ভাবিতে লাগিল যেন স্বপনে জাগিয়া।

বিভু কী দশা হবে আমার

বিভু কী দশা হবে আমার,
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন—
সব আশা চূর্ণ করে রাখিলে অবনীপরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥
আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত, পদ, নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ হরিলে সর্বস্ব ধন
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে।
চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রাখিতে নাহিকো কেউ
সদা ভয়ে পরান শিহরে,
যখনি আগের কথা, মনে পড়ে পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে।
কোথা পুত্র-কন্যা-দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান ;
ভাবিতে সেসব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্তিমান।
সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়ে চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে ;
বল-বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
করে ভবে বাঁধিয়ে রাখিলে।
জীবনে বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার,
চির-অস্তমিত দিনমণি।
ধরা-শূন্য-স্থল-জল, অরণ্য-ভূমি-অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার,
না রবে নয়নে দৃষ্টি তমোময় সব সৃষ্টি,
দশদিক ঘোর অন্ধকার—

বিভু কী দশা হবে আমার ॥
প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে ;
আমার রজনী শেষ, হবে না কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে?
আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে,
শিশির বসন্তকাল, আসে-যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোনো কালে!
বিহঙ্গ-পতঙ্গ-নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানব-বদন।
নিজ কন্যা-পুত্র-মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণ মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা ;
কী নিয়ে থাকিব তবে, তবে কী সাধনা হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে করো পার—
বিভু! কী দশা হবে আমার!

কী হবে কাঁদিয়া?

কী হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া
সবারি এ দশা কিছু চির নয়,
চিরদিন কারো নাহি রয় স্থির,
চিরকাল কারো সমান না যায়।
পরিবর্তময় সদা এ জগৎ।
নাহি ভেদাভেদ ক্ষুদ্র কি মহৎ ;
হ্রাস-বৃদ্ধি-নাশ যার যে নিয়ত,

পল-অনুপল পৃথিবীময়।
আমি কিবা ছার নগণ্য পামর,
শত-শত কত মহাভাগ্যধর,
বিরাট সম্রাট দেবতুল্য নর,
উন্নতি পতন সবার হয়।
কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম?
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম?
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা?
কোথায় মথুরা কোথায় দ্বারকা?
কে পারে লঙ্ঘিতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে?
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে?
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?
এসো ভগবান, করো ধৈর্য দান,
করো শান্তিময় অশান্ত পরান।
সৌভাগ্য-অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজ কর্ম যেন সাধিতে পারি ॥
সুচির বসন্ত, হাসে না ধরায়,
না চিরহেমন্ত ধরণী কাঁপায়,
উত্তপ্ত নিদাঘ প্রাবৃটে জুড়ায়,
অনিত্য সকলি বিধির ইচ্ছায় ;
দুর্দিনের দিন যেই বলীয়ান,
সহিতে বিধির কঠোর বিধান!
নমে না টলে না নহে ম্রিয়মাণ,
যে পারে তাঁহারি জীবন ধন্য!
এ ভব-সাগর ধ্রুব লক্ষ করে
রাখিতে আপনা আবর্তের ঘোরে,
না হারায়ে কূল না ডুবে পাথারে,
নাহি রে নাহি রে উপায় অন্য ॥
আমা হতে আরো কত ভাগ্যধর,
হারায়ে সাম্রাজ্য শৌর্য-বীর্য আর,
পড়িছে ভূতলে অদৃষ্টের ফলে,
ধৈরজে আবার বাঁধিছে হিয়ে।
কী ছার আমি যে হয়ে ভাগ্যহীন,
কাঁদি এত ভাবি দেখিয়া দুর্দিন,
কেন কাঁদি এত কেন বা কাঁদাই,
রাখো আমায় নাথ ধৈরজ দিয়ে ॥

আপনারই দোষে আপনি হারাই,
বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই,
এ সান্ত্বনা কেন পরানে না পাই।
নিজ কর্মফল অদৃষ্টে কেবল!
কতদিন তরে এ জীবন রয়,
সংসারের খেলা সবই স্বপ্নময়,
বুঝিয়াও মন বুঝে না তো তায়,
কেন সদা ভাবি হইয়া বিফল?
আমি-আমি করি, কে আমি রে ভবে?
কেন অহংকার এত দম্ভ তবে,
নাম-গন্ধ-চিহ্ন সকলই ফুরাবে,
দু-দিন না যেতে ভুলিবে সবে।
ভুলো না ভুলো না শেষের সেদিন,
মহানিদ্রাঘোরে ঘুমাবে যেদিন,
আবাস-ভাণ্ডার বিভব-বিহীন,
যার ধন তার পড়িয়া রবে ॥
দাসে দয়াবান হও ভগবান,
ঘুচাও মনের ঘোর অভিমান,
কর কৃপাময় কৃপাবিন্দু দান,
হৃদয়-বেদনা ঘুচায়ে দাও।
ডাকি হে শ্রীহরি শ্রীচরণে ধরি,
মোহ-অন্ধকার দাও দূর করি,
দেহ শান্তি প্রাণে এই ভিক্ষা করি,
অভাগার শেষ আশা মিটাও ॥

কৌমুদী

হাসো রে কৌমুদী হাসো সুনির্মল গগনে,
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে।
সুধা পেয়ে সিন্ধুতলে
দেবতারা সুকৌশলে
লুকাইয়া চন্দ্রকোলে লেখা আছে পুরাণে
বুঝি কথা মিথ্যা নয়,
নহিলে চন্দ্র উদয়,
কেন হেন সুধাময় ব্রহ্মাণ্ডের নয়নে।

আহা কী শীতল রশ্মি চন্দ্রমার কিরণে,
যেখানে যখন পড়ে
প্রাণ যেন লয় কেড়ে,
ভুলে যাই সমুদয়,
চেতনা নাহিকো রয়,
জাগিয়া আছি কি আমি কিংবা আছি স্বপনে।

আহা কী অমিয় খনি শরতের গগনে!
কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি,
যেই হেরি- পূর্ণশশী,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাই
শুধু সেইদিকে চাই,
হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমেষ-নয়নে।
পড়ে কিরণের ঝারা ঢাকি হৃদি বদনে,
যত হেরি সুধাকরে,
হৃদয়েব জ্বালা হরে,
কোথা যেন যাই চলে,
স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,
সংসারের সুখ-দুঃখ নাহি থাকে স্মরণে।

খদ্যোত

কী শোভা ধরেছে তরু খদ্যোত-মালায়,
শাখাখণ্ড সমুদয়, হয়েছে আলোকময়,
কী চারু সুন্দর শোভা জুড়ায় নয়ন!
নীল আভা পুচ্ছে ঝরে, শোভিতেছে তরুপরে,
লক্ষ আলোকের বিন্দু ফুটিছে যেমন।
হেরে মনে হয় হেন, সোনার তরুতে যেন,
লক্ষ হিরাখণ্ড জ্বলে, জড়িত কাঞ্চন!
কখনো বা মনে হয় তরুটি যেমন,
আলোকে ডুবিয়া আছে, সর্ব-অঙ্গ ঝকিতেছে,
মনোহর নীলকান্ত কাঞ্চন-কিরণ।
অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে,
বিন্দু-বিন্দু স্বর্ণ-ফুলে, চারু কারুকার্য তুলে
ঢাকিয়া রাখিছে তরু করি আচ্ছাদন।
কিন্তু পরদিন প্রাতে উদিলে তপন,

কাছে গিয়া হের তায়, কোথায় কাঞ্চন হায়,
দারুময় তরু সেই পূর্বের মতন।
কোথা বা হীরকমালা নয়ন-রঞ্জন,
তরুতলে-ডালে-গাছে, দেখিবে পড়িয়া আছে,
কেবল জোনাকি পোকা পাঁতি অগণন।
হায় রে কতই হেন বিচিত্র দর্শন,
মানবের সুখকর, নয়ন-মানস-হর,
করেছেন ভগবান ভূতলে সৃজন।
দিবা-বিভাবরী যোগে কতই এমন,
শ্রুতি-দৃষ্টি মনোলোভা, সৃষ্টি করেছেন শোভা,
মূলহীন সত্ত্বহীন স্বপন যেমন।
আহা বিধাতার এই মায়ার সৃজন,
নহে বঞ্চনার তরে, শুধুই জুড়াতে নরে,
মায়াজালে জড়ালেন নিখিল ভুবন,
না বুঝে কৃতঘ্ন নর বিধির মনন।
নিন্দা করে এ কৌশলে, তাঁহারে নিষ্ঠুর বলে,
বলে তিনি জীবগণে করেন বঞ্চন।

ফুল

দেখ কী সুন্দর ফুলটি বাগানে,
ফুটিয়া উদ্যান আলো করে আছে ;
লাল রঙে মরি কী শোভা উহার,
অরুণের প্রভা অঙ্গে মাখিয়াছে!
এ সৌন্দর্য আর কদিন থাকিবে,
জুড়াবে এরূপে নয়ন-মন?
কাল না ফুরাতে পরশু হেলিবে
বোঁটাটি উহার, ফুরাবে যৌবন।
হবে নতশির ঝুলিয়া পড়িবে,
এ শোভা তখন থাকিবে না আর,
ক্রমে পত্রচয় শুকায়ে আসিবে,
ভূতলে পড়িবে করে ঝরঝর।
মানুষের(ও) দেহ-সৌন্দর্য এমনি,
দিনকয় মাত্র তরুণ-তরুণী,
যৌবনের কাল ফুরায় যখন,

সে শোভা-সৌন্দর্য ফুরায় অমনি।
দেখিলে তখন শ্লথ-শুষ্ক কায়,
সে যুবা যুবতী চেনা নাহি যায়,
বার্ধক্য যখন পরশে তাদের,
দেখিলে তখন হৃদি ব্যথা পায়।
জগতের অঙ্গে নিয়ত নিরখি,
পূর্ণ শোভা আজ প্রকাশিয়া আছে,
কাল আর তার চিহ্নমাত্র নাই,
ভেঙেচুরে যেন কোথায় গিয়াছে।
কেন ভগবান হেন নিষ্ঠুরতা,
জগতের প্রতি এত কি বাম?
না থাকিতে দাও কিছুকাল তরে,
যা দেখে পরানে এতই আরাম?
বিধি কি হে তুমি মনে ভাব লাজ,
নিজ নিপুণতা দেখাইতে ভবে?
কিবা জীব-সুখে এত হিংসা তব,
না ভুঞ্জিতে দাও তব বিভবে।
এত কী হে সুখ দিয়াছ জগতে,
এ সুখের আর প্রয়োজন নাই,
দোহাই তোমার তুমি জান ভালো
এ ভব তোমার কী সুখের ঠাঁই।

সরিৎ—সময়

তরতর করে চলিছে সলিল
শিলা তরুমূল করিয়া শিথিল ;
ধীরে-ধীরে মাটি ফেটে ছড়ে ছড়ে
কূলে-কূলে জলে ধস ভেঙে পড়ে।
লতাপাতা-বেত স্রোতাবেগে কাঁপে ;
তরুলতা ঝোপে তীরে ঝাঁপি ঝাঁপে।
ঝিরঝির করে মাটি ঝরে পাড়ে,
তরুলতা স্রোতে সমূলে উপাড়ে!
সরসর বালি জলতলে সরে,
বাধা পেয়ে শেষে দ্বীপরূপ ধরে।
আম, জাম, শাল, জারুল, তিন্তিড়ী,
তীরে ছায়া করি চলিছে দু-ধারি।

ফুল-তরুদল দু-কূলে সুন্দর,
ফুল-গন্ধে বায়ু করে ভর-ভর।
জলচর পাখি তীর ছাড়ি ছুটে,
মীন মুখে করি পাতা ঝাড়ি উঠে।
চলে স্রোত-ধারা ভাঙে গড়ে কত,
আপনার বলে খুলে লয় পথ ;
বাঁধ-বাধা-বাঁক কিছু নাহি মানে,
দিবা-নিশি চলে আপনার মনে।
উজির-আমির-কাঙাল না গণে,
চলে দিবানিশি আপনার মনে।
তরতর করে চলেছে সময়,
পল-অনুপল কার(ও) লক্ষ্য নয়,
গতিচিহ্ন খালি ধরা-অঙ্গে লেখা,
কালের প্রবাহ তাই যায় দেখা,
কত ভাঙে-গড়ে স্রোতধারা তার,
ভূমণ্ডলময় সংখ্যা করা ভার।
নব কিশলয়সম শিশুগণ,
প্রফুল্ল-কুসুমসম যুবাজন,
কাল-নদী কূলে তরুলতামতো
বাড়ে দিনে-দিনে শোভা ধরি কত।
তরুণ যৌবন পূর্ণ হলে পরে,
সরল-সুঠাম-প্রৌঢ়কান্তি ধরে।
বার্ধক্য-জরায় শুকায়ে যখন,
কালগর্ভে পড়ে হয় অদর্শন ;
অবিচ্ছেদ-গতি বহে কাল-স্রোত,
ধরা-অঙ্গে কত করি ওতপ্রোত।
রেণু-রেণু করি পর্বতের চূড়া।
কালে ভগ্ন হয়ে হয়ে যায় গুঁড়া।
বালুকার স্তূপ বেড়ে-বেড়ে কালে,
পর্বত-আকারে ঠেকে শূন্যভালে।
আজ মরুভূমি কাল জলে ঢাকা,
বিপুল তরঙ্গ চলে আঁকাবাঁকা।
আজ রাজ্যপাট অট্টালিকাময়,
কাল মহাবন শ্বাপদ-আশ্রয়!
কাল-স্রোত-ধারে নর-ক্রৌঞ্চ কত,
নীরে লক্ষ করি ভ্রমে অবিরত ;
অবসর বুঝে স্রোতে মগ্ন হয়,

ভক্ষ্য মুখে করি বৃক্ষে উড়ে যায়,
পক্ষ ঝাপটিয়া পূর্ববেশ ধরে,
উচ্চ ডালে বসি ভক্ষ্য জীর্ণ করে।
চলে কাল-স্রোত নাহি দয়ামায়া,
চলে মুখে নিয়া শিশু-বৃদ্ধ-কায়া।
রাজা-দুঃখী-ধনী প্রভেদ না গণে,
চলে অবিরত আপনার মনে।
তরতর করি কাল-স্রোত যায়,
সরিৎ সময় দুই তুল্যপ্রায়।

কল্পনা

কী দেখিনু আহা-আহা,
আর কী দেখিব তাহা,
অপূর্ব সুন্দরী এক শূন্য আলো করি ;
চাঁদের মণ্ডল হতে,
উঠিছে আকাশ-পথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঢলি।
ভাবভরা মুখখানি,
আহা মরি কী চাহনি,
কটাক্ষে ভুলায় নর অমর ঋষিরে,
কী ললাট কিবা নাসা,
মন-ভাষা পরকাশা,
ওষ্ঠাধরে হাসি-রেখা নৃত্য করি ফিরে।
বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্রধনু শোভা পায়,
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়,
যেখানে উদয় হয়,
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক আমোদে পুরায়।
কখনো শিখর-শিরে,
বসিয়া নির্ঝর-তীরে,
মিশায়ে বীণার স্বরে গানে মত্ত হয়,
কভু কোনো কুঞ্জবনে,
প্রবেশি প্রমত্ত মনে,
নৃত্য করে নিজ মনে অধীরা হইয়া ;

কখনো তটিনী-নীরে,
ধৌত করি কলেবরে,
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া।
কভু মরুভূমি-গায়,
ফুলোদ্যান রচি তায়,
শুনিয়া পাখির গান করয়ে ভ্রমণ ;
কভু কী ভাবিয়া মনে,
একাকী প্রবেশি বনে,
হাসে-কাঁদে নিজ মনে উন্মাদ যেমন।
কখনো মন্দিরে ধায়,
পূজা করে দেবতায়,
জগৎ-মাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়,
কখনো নন্দন-বনে,
অপ্সরী অমরীসনে,
খেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলায়।
কখনো অদৃশ্য হয়ে,
ছায়াপথে লুকাইয়ে,
দেখায় কতই ছলা কত রূপ ধরি,
সদাই আনন্দ মন,
সর্বত্র করে গমন,
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণী-দুঃখ হরি।
স্বর্গ-মর্ত-রসাতল,
সব(ই) তার লীলাস্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে,
তিন লোক আসে-যায়,
সর্বত্র আদর পায়,
সে মনোমোহিনী মূর্তি সকলেই জানে।
কভু ছায়াপথ ছাড়ি,
আর(ও) শূন্যে দিয়া পাড়ি,
দেখায় অপূর্ব কত ত্রিলোক মহিমা ;
উঠিতে-উঠিতে বালা
দেখাইছে কত ছলা,
কত রূপে কত মতে নাচিয়া-গাইয়া।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী,
হেরিয়া আশ্চর্য মানি,
বিস্ফারিত-নেত্রে সবে বামা-পানে চায়,
ধরা উলটিয়া ফেলে,
স্বর্গ আনে ধরাতলে,

অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায়।
চলে বামা বায়ুপথে,
পুরাইয়া মনোরথে,
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয় ;
কখন(ও) পাতালপুরী,
আলোক-উজ্জ্বল করি,
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্যোদয়।
মরুতে উদ্যান রচে,
মরে প্রাণী পুনঃ বাঁচে,
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভানু স্নিগ্ধকায়,
চপলা চাপিয়া রাখে,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়।
কতই বিস্ময়কর,
কার্য হেন হেরি তার,
সুচতুর বাজিকর জাদুর সমান,
হেলায় পুরায় সাধ,
সাগরে বাঁধিয়া বাঁধ,
অগাধ জলধি-জলে ভাসায়ে পাষাণ।
পশু-পক্ষী কথা কয়,
"বানরে সংগীত গায়"
গিরি-অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায় ·
কখনো নাবিকদলে,
ছলিবারে কুতূহলে,
অতল সাগরজলে কমল ফুটায়।
ক্ষণ নিমেষের মাঝে,
মহানগরীর সাজে,
সাজায় কখনো বন গহন কাননে,
কখনো বা মহারঙ্গে,
ভাঙিয়া ধরণী-অঙ্গে,
সৌধমালা অট্টালিকা মথয়ে চরণে।
কভু মহাশূন্যপরে,
সৌর জগতের ধারে,
দেখায় নূতন সূর্য নূতন আকাশ,
নবীন মেঘের মালা,
নবীন বিজলি-খেলা,
নব-কলাধার শশি-কিরণ প্রকাশ।

স্বর্গ-শূন্য-ধরাপর,
কত হেন কল্পনার,
অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে-দেখিতে,
বিচরি ব্রহ্মাণ্ডময়,
হর্ষ-পুলকিত কায়,
হেরি কত অভ্যোদয় হয় ধরণীতে।
ভাবি কত দূর যাই,
যেন তার অন্ত নাই,
শেষে না দেখিতে পাই কোথা যাই চলে
সুদূর গগন-গায়,
শেষে মিশাইয়া যায়,
চপলা চমকে যেন মেঘের মণ্ডলে।
সহসা চৌদিকে চাই,
তখনি দেখিতে পাই,
সেই আমি সেই ধরা সেই তরু-জল,
যাইনি নিমেষ-পল,
ছাড়িয়া এ ধরাতল,
তবুও ভ্রমিনু স্বর্গ-মর্ত-রসাতল।

এ হেন প্রভাব যার,
প্রসাদ লভিতে তার,
কী দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি ;
প্রতিদিন কল্পনারে,
পাই যদি পূজিবারে,
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি।
এ চির মনের সাধ,
মিটিল না অপরাধ,
লয়ো না দুঃখিনী মা গো দৈব-প্রতিকূল,
কমল্যা ঠেলিয়া পায়,
রোধ কৈলা সারদায়,
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল-ফুল।

প্রজাপতি

কে জানে মহিমাময় মহিমা তোমার,
সামান্য পতঙ্গ এই,

ইহার তুলনা নেই,
কী চিত্র-বিচিত্র করা অঙ্গেতে ইহার।
কীসে ফলাইয়ে রং করেছ এমন!
কে জানে জগৎ-মাঝে,
কে পারে তুলির ভাঁজে,
তুলিতে এমন চিত্র সুন্দর চিকন।
খেলায় রঙের ঢেউ কী রেখাই টেনেছ,
ভিতরে-ভিতরে তার,
বিন্দু-বিন্দু চমৎকার,
কিবা ছিটাফোঁটা দিয়ে সাজায়ে রেখেছ।
লতায় বসিয়া পাখা দুলায় যখন,
কিরণ পড়িলে তায়,
কার চক্ষু না জুড়ায়,
এ মহীমণ্ডল-মাঝে কে আছে এমন!
কী এ শোভা-আকর্ষণ বলিতে না পারি,
ভুলায় শিশুরও মন,
কত আশা আকিঞ্চন,
কতই আনন্দে ছোটে ধরি-ধরি করি।
ধরিতে না পারে যদি কী হতাশে চায়,
ধরিতে পারিলে সুখ,
ভুলে সর্ব শ্রম-দুখ,
মুখেতে কী হাসিছটা পুলকিত কায়।
দেব-শিল্পকর-কীর্তি বাখানে সবাই,
বলো তো বিশাই শুনি,
কী কার্য তোমার গুণী,
এর সঙ্গে তুল্য দিতে কোথা গেলে পাই!
সামান্য পতঙ্গ এই শোভা কারিগুরি,
ক্রমশ উন্নত স্তর,
আরো কত শোভাধর,
কী আশ্চর্য বিধাতার নৈপুণ্য-চাতুরী।
এত দম্ভ কর নর আপন কৌশলে!
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি গাত্রে,
প্রতি রেখা প্রতি ছত্রে,
দেখো শোভা দেখো বিশ্ব কী কৌশলে চলে।
কিছুই না পাই ভেবে আদি-অন্ত-সীমা ;
সকলি আশ্চর্য তব,
অদ্ভুত তোমার ভব,
কে জানে মহিমাময় তোমার মহিমা।

ভালোবাসা

ভালোবাসাবাসি এত পৃথিবী-ভিতরে,
সে তৃষ্ণা মিটে না কেন আমার অন্তরে?
বাল্য হতে নিরন্তর খুঁজিয়া বেড়াই,
প্রাণ জুড়াবার সখা তবু নাহি পাই।
কারে ভালোবাসা বল, কিবা তার ধারা?
কী পেয়ে প্রাণের তৃষ্ণা মিটাও তোমরা?
পিতা ভালোবাসে কন্যা-পুত্র আপনার,
স্বামী ভালোবাসে ভার্যা প্রিয়তমা তার।
ভাই ভালোবাসে ভা(ই)য়ে সোদরা সোদর,
প্রতিপালকেরা ভালোবাসে পোষ্য তার,
আশ্রিতে আশ্রয়দাতা ভাবে আপনার,
প্রণয়িনী প্রণয়ীর হৃদয়ের হার।
এ যে ভালোবাসা-ভরা দেখি এ সংসার,
ভালোবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,
স্নেহ-দয়া-মায়া আর যাহা কিছু বল,
ভালোবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল।
প্রাণে-প্রাণে বিনিময় ভালোবাসা যেই,
সে ভালোবাসা তো হেথা দেখিবারে নেই,
কতজনে হাতে তুলে দিয়েছি তাহায়,
সে তো নাহি প্রাণ তার দিয়েছে আমায়।
আমি চাই এক জিউ এক তৃষা মন,
এক চিন্তা এক দৃষ্টি একই শ্রবণ,
এক রাগ-অনুরাগ একই মনন,
দুই-দুই ঘুচে গিয়ে একত্র মিলন।
অনন্য মনের গতি,
অনন্য কল্পনা-স্মৃতি,
অনন্য আকাঙক্ষা-আশা,
অনন্ত প্রাণের তৃষা,
এক জ্ঞান এক ধ্যান একই স্বপন,
তার (ই) নাম ভালোবাসা দুজনে মিলন।
এক প্রাণ দুই দেহ,
অভেদ শত্রুতা-স্নেহ,
অভেদ আচার-ভক্তি,
দুই দেহ এক(ই) শক্তি,

পাষাণে পরান গাঁথা একাত্মা জীবন,
এ ভালোবাসারে মোরে দিবে কোন জন?
এই ভালোবাসা-আশে উন্মত্ত হইয়া,
লজ্জা-ভয়-লোকনিন্দা সব তেয়াগিয়া,
পরানে-পরানে তার হইতে সমান,
অনেকের হাতে সঁপে দিয়াছি পরান।
কতজনে কতবার সোদর অধিক,
জড়ায়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,
বৃশ্চিক-দংশন হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,
কেঁদেছি রজনী-দিবা যাতনার ক্লেশে।
কতবার কতজনে কণ্ঠের ভূষণ,
করিয়া রেখেছি বুকে ভাবিয়া রতন,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুঝিয়া স্বপন,
করেছি কতই তপ্ত-অশ্রু বিসর্জন ;
ভালোবাসা বলি যারে পরানে ধেয়াই,
সে ভালোবাসারে হায় কোথা গেলে পাই?
পরানের বিনিময়ে পরান বিকাই,
এ ভালোবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই?

অতৃপ্তি

বিধাতা হে নাহি জানি প্রাণে কেন হেন গ্লানি
মাঝে-মাঝে বিরক্তি উদয়,
থাকিতে এ ভবনিধি পরানে কেন এ ব্যাধি
বলো বিধি বলো হে আমায়।
আজ নয় নহে কাল এই ভাব চিরকাল
কেন মম হেন তিক্ত হয় ;
কিছুই না ধরে মনে অসাধ্য সদাই প্রাণে
কিছুতেই সাধ নাহি রয়।
আমোদ-প্রমোদ হাসি সব(ই) যেন যায় ভাসি
কিছুতেই মন নাহি বসে ;
নিকটে প্রাণের মিতা শুনায় রসের গীতা
তাহাতেও চিত্ত নাহি রসে।
সুত-সুতা স্নেহভরে চিবুক তুলিয়া ধরে
কণ্ঠে ধরি কোলে বসি হাসে ;

তাতেও চেতনা নাই সেদিকে না ফিরে চাই
যেন কোনো অমঙ্গল-ত্রাসে।
এ অতৃপ্তি কেন সদা ধন-যশ কি প্রেমদা
কিছুই সন্তোষকর নহে ;
নাহিকো আকাঙ্ক্ষা-আশা নাহিকো কোনো লালসা
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে।
মুখে ব্যঙ্গ-পরিহাস হৃদে খেদ বারোমাস
ফলগুসম লুকাইয়া চলে ;
বাহিরে আলোক-পূর্ণ হৃদয়ে অঙ্গার-চূর্ণ
প্রাণে সদা বহ্নিশিখা জ্বলে।
কেন হেন তিক্ত প্রাণ দিলে মোরে ভগবান
এই সুখ-জগতে তোমার ;
নাহি কি কিছুই তায় মম সাধ মিটে যায়
কোন হেন সুন্দর সুতার।
ফুলতরু কত জাতি কত বর্ণ কত ভাতি
আছে এই জগৎমণ্ডলে ;
ধরা শূন্য শোভাকর কত পশু-পক্ষী-নর
শৈবাল-মৃণাল-মীন জলে।
আকাশে চাঁদের শোভা জগতের মনোলোভা
মনোহর তারকা ঝলকে ;
যেটি মনে ধরে যার সেটি আদরের তার
চিরকাল এই ধরা লোকে।
উদ্যানে কাহার(ও) সাধ কুসুমে কারো আহ্লাদ
কারো সাধ প্রাসাদ-ভবনে,
কেহ বা পক্ষীর গান শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ,
কেহ মুগ্ধ সংগীত-শ্রবণে।
কেহ ভুলে চিত্রপটে কেহ বা কবিতাপাঠে
কারো মন সৌন্দর্যে মগন ;
কেহ সুখী ধনার্জনে কেহ সুখী ধনদানে
কারো সাধ সমৃদ্ধি-সাধন!
কেহ রত বিদ্যাভ্যাসে কেহ বা কেশবিন্যাসে
বিলাস-বাসনা করে কেহ ;
ভোগসুখ কেহ চায় কেহ অনাদরে তায়
বনে যায় তেয়াগিয়া গেহ।
হেন রূপে সর্বজন কোনো না কোনো বন্ধন
হৃদয়ে বেঁধেছে সুখ-আশে ;
পূর্ণ করি সেই আশা জুড়ায় হৃদি-পিপাসা

অকূল সাগরে নাহি ভাসে।
আমারি হৃদি কেবল ছায়া-শূন্য মরু-স্থল
কোনো বাসনায় বদ্ধ নয় ;
এত শোভা ধরণীতে, কিছুই না ধরে চিতে
শূন্য প্রাণে দেখি সমুদয়।
কী হেতু হে ভগবান দিয়াছ এমন প্রাণ
সুখের সাগরে সবে মজে ;
স্থলে-জলে-ভূমণ্ডলে সুখের লহরী চলে
কীসে সুখ আমি মরি খুঁজে।
সয়েছি অনেকদিন সব আর কতদিন
দিনে-দিনে ডুবি হে পাথারে ;
সত্বর এ প্রাণ হরি এ দুঃখ ঘুচাও হরি
এ যাতনা দিও নাকো কারে ॥

মৃত্যু

কে আসিছে অই আঁধার-বরণ,
লৌহদণ্ড করে করিয়া ধারণ।
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ নয়নের ছটা,
দেহের বরণ ঘোর ঘনঘটা,
চুপে-চুপে আসি ছায়ার মতন,
মুমূর্ষু প্রাণীরে করে নিরীক্ষণ।
মৃত্যুশয্যাশায়ী-শিয়রে দাঁড়ায়ে,
নিজ দণ্ড তার শরীরে ঠেকায়ে,
বলে "ওরে আয় আর দেরি নাই,
আয় সঙ্গে মোর, আমি নিয়ে যাই,
যে দেশে নাহিকো সূর্য-চন্দ্র-তারা,
যেখানে দেখিবি অদেহী যাহারা,
কোথা এবে তোর বয়স্য যাহারা,
যাহাদের পেয়ে হয়ে জ্ঞানহারা,
যৌবন-মদিরা পিয়েছিলি রঙ্গে,
কৌতুক, বিলাস, ব্যসন-তরঙ্গে,
ভাসিতিস ধরা সরার মতন ;
এখন তাদের কাঁদিছে কজন?
দেখ একবার এই শেষ দেখা,

যাদের চিত্র তোর প্রাণে লেখা,
যাদের পাইয়া মনের মতন,
সাজাইলি তোর ভব-নিকেতন,
পুত্র-পৌত্ররূপ ভবরত্ন-চয়,
কোথা রবে এবে সেই সমুদয়?
দেখে নে রে তোর স্নেহময়ী মায়,
(আর কভু চোখে দেখিবি না হায়,)
কাঁদিছে এখন হয়ে দিশেহারা,
ধরায় পড়িছে পাগলিনী-পারা,
সেও যাবে ভুলে কিছুদিন পরে,
কদাচিৎ যদি কভু মনে করে।
ওই দেখ তোর প্রাণাধিকা নারী,
যারে লয়ে তুই হলি রে সংসারী,
তোর মুখ চেয়ে করিছে ক্রন্দন,
নিস্পন্দ নির্বাক পাষাণ যেমন,
কিছুকাল পরে সেও রে ভুলিবে,
ফিরে এলে কাছে চিনিতে নারিবে,
দাঁড়ায়ে শিয়রে হারায়ে সংবিৎ,
ওই যে তোমার প্রাণের সুহৃৎ,
যারে কাছে পেলে আর সবে ফেলে,
থাকিতে দিবস-রজনী বিরলে,
কতদিন মনে রাখিবে তোমায়,
ভুলিবে যেদিন পাবে অন্য কায়।
এই যে রে তোর গৃহ-অট্টালিকা,
মঠ, অশ্বশালা, তোরণ, পরিখা,
এ নাট্যমন্দির-হ্রদ-পুষ্করিণী,
বিচিত্র চক্রিণী পতাকাশালিনী,
কোথা রবে সব মুদিলে নয়ন,
কে ভোগ করিবে এসব তখন?
তুই নিজে যাবি ভুলিয়া সকলি—
দারা-পুত্র-সখা এ ধরামণ্ডলী,
ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য, বিভব,
দয়া-মায়া-স্নেহ জনকলরব,
একাকী উলঙ্গ সঙ্গে যাবি মোর,
কিছুই সঙ্গেতে যাবে না রে তোর।
এইসব তরে হয়ে চিন্তাকুল,
আজন্ম ঘুরিলি যেন বা বাতুল,

সকলি ফেলিয়া যেতে হল এবে,
কার ধন হায়! এবে কেবা নেবে!
সব(ই) ফেলে গেলি সব বিলাইলি,
পথের সম্বন্ধ কিবা সঙ্গে নিলি?
আচম্বিতে নাভিশ্বাস দেখা দিল,
মৃত্যু-শয্যাশায়ী নয়ন মুদিল,
ধীরে-ধীরে মুখ হইল ব্যাদান,
সেই পথে প্রাণ করিল পয়াণ,
ফুরাইল এক জীবের জীবন,
ভাঙিল ভবের একটি স্বপন,
দিবস-রজনী কত হেনরূপ,
শুনিছে মানব শমন-বিদ্রূপ ;
দেখিছে নয়নে কত শতজনে,
মরে ফুরাইছে প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে,
তবুও কিবা যে মায়ার বন্ধন,
সে কথা কাহার(ও) থাকে না স্মরণ ;
কার সাধ্য বুঝে সংসার-রচনা?
ধন্য বিধি! মায়া-সৃজন-কল্পনা!

কবিতা সুন্দরী!

অশোকের তলে যেন শশী জ্বলে
হেন রূপবতী নারী,
ভাবিছে একাকী করে গণ্ড রাখি
অপূর্ব শোভা প্রসারি।
সুনিবিড় কেশ ঢাকি পৃষ্ঠদেশ
ছড়ায়ে পড়েছে এলা,
ঘুরিছে-ফিরিছে উড়িছে-পড়িছে
পবনে করিছে খেলা।
নব তৃণদল আসন কোমল
বসেছে চরণ মেলি,
রাঙা পদতল করে ঝলমল
তরু-দেহে আছে হেলি।
করি-শুণ্ডাকার ক্রমে লঘুতর
উরু জিনি সুকদলী ;

নিতম্ব পীবর   স্তন মনোহর
অস্ফুট কমল-কলি।
ত্রিবলী-অঙ্কিত   কণ্ঠ সুশোভিত
পক্কবিম্ব ওষ্ঠাধর ;
সিন্দূরে মার্জিত   মুকুতার মতো
দন্তপাঁতি শোভাকর।
শ্রবণ কুহর   মদনের গড়
বাঁশরি সদৃশ নাসা ;
শ্বেতাভ্র বরণ   চন্দ্রনিভানন,
খঞ্জন নয়ন-ভাসা।
পুষ্প থরে-থর   শোভা মনোহর
শাখা এক শিরোপরে,
মন্দ-মন্দ দোলে   পবন-হিল্লোলে
বৈসে বামা গণ্ড করে।
ডালে-ডালে পাখি   নানা বর্ণ মাখি
করিছে মধুর গান ;
থেকে-থেকে-থেকে   ডালে অঙ্গ ঢেকে
কেহ ধরে উচ্চতান।
মন্দ-মন্দ বায়   তরু-অঙ্গে ধায়
পত্র কাঁপে থর-থর :
পবন-হিল্লোলে   পল্লবেরা দোলে
শব্দ হয় মর-মর।
কত বনচর   তনু মনোহর
আবৃত রঞ্জিত লোমে ;
অভয় পরানে   দূরে সন্নিধানে
অবিরত সুখে ভ্রমে।
হরিণী সুন্দরী   শিশু কাছে করি
ভ্রমে নৃত্য করি সুখে ;
করিণী সুখিনী   তুলে মৃণালিনী
দেয় নিজ শিশুমুখে।
গাভী-বৎস চরে   হাম্বা রব করে
কেহ না দেখিলে কায় ;
চরিতে-চরিতে   চমকিত চিতে
তৃণ-মুখে মৃগ যায়।
ভ্রমে নীল-গাই   প্রাণে ভয় নাই
অদূরে অথবা দূরে ;
বিচরে চমরী   লোমশী সুন্দরী

বনমাঝে ঘুরে-ঘুরে।
সেথা পরকাশে প্রমত্ত উল্লাসে
কবি-প্রিয় ঋতুচয় ;
বসন্ত, বরষা সরস সুষমা
শরৎ সৌন্দর্যময়।
নিকটে উদ্যান অতি রম্য স্থান
দেবতা-গন্ধর্ব ভুলে ;
সুগন্ধামোদিত সদা সুশোভিত
নানা জাতি তরুফুলে।
ফুলে রেণু-গায় সদা ভ্রমে তায়
মন্দ-মন্দ সমীরণ ;
আকাশে সৌরভ মাটিতে সৌরভ
সুগন্ধ বর্ষে যেমন।
গাছে মধু ক্ষরে, লতা-পত্র ঝরে
উড়ে ভৃঙ্গ-মধুকর ;
সুষমা সুঘ্রাণ ভরিয়া উদ্যান
গন্ধে ভরা সরোবর।
সেসব উদ্যানে মহিমা কে জানে
নিত্য চন্দ্রোদয় হয় ;
নিত্য ষোলো কলা শশাঙ্ক উজলা
চির-জ্যোৎস্না ফুটে রয়।
ভ্রমে কত সেথা অপ্সর-বনিতা
গীত-বাদ্য-নৃত্য করি ;
কত নিরজনে নির্ঝর-দর্পণে
নিজ-নিজ বিম্ব হেরি।
কত বনদেবী ফুলঘ্রাণ সেবি
ভ্রমে সাজি ফুল-সাজে,
নর্তন-বাদন রত সর্বক্ষণ
সে দেব কানন-মাঝে।
নাচিয়া-গাহিয়া পুলকে পূরিয়া
এরা সবে মাঝে-মাঝে ;
প্রেম-ভক্তি-ভরে পুলকেতে পূরে
আনন্দে বামারে পূজে।
মিলি রস নয় করে অভিনয়
বামার প্রীতির তরে ;
বীর-রৌদ্র-হাস্য করুণার দৃশ্য
নয়নে তুলিয়া ধরে।

সব রস যেন মূর্তিমান হেন
হৃদয়ে প্রত্যয় হয় ;
ক্রোধ-ভয় আদি বসে বামা-হৃদি
কভু অশ্রুধারা বয়।
হেন রূপে কেলি নবরস মেলি
করে সমাদরে রাখে ;
ক্রীড়া সমাপনে তৃষিত নয়নে
বামারে ঘেরিয়া থাকে।
সে বামারে ঘেরি বসিয়াছে হেরি
মহাপ্রাণী কতজন ;
অনিমেষ নেত্র নাহি পড়ে পত্র
হেরে সে রাঙাচরণ।
কত ঋষি-নর মহাজ্যোতির্ধর
বসেছে বামারে ঘেরে ;
স্বদেশি-বিদেশি কতই যশস্বী
কেবা সংখ্যা তার করে।
সেখানে বসিয়া জ্যোতি ছড়াইয়া
মহাকবি ঋষি ব্যাস ;
নব প্রভাকর সম জটাধর
বাল্মীকি সেথা প্রকাশ।
কবি কালিদাস সুধাসম ভাষ
বাণী-বরপুত্র যেই ;
অমরের ছবি সেক্ষপীর কবি
বিজলি যেন খেলাই।
ধরণী উজলি বুধের মণ্ডলী
বসে সেথা স্তরে-স্তরে ;
নিজ যন্ত্র ধরে সুধাকণ্ঠস্বরে
সে চরণ পূজা করে।
দেব-মনোলোভা হেরি সেই শোভা
কার না বাসনা করে ;
এ যশোমালায় পরিতে গলায়
রাখিতে হৃদয়ে ধরে।
অয়ি নিরুপমে মম হৃদি-ধামে
বাসনা আছিল কত,
তব আরাধনা তোমার সাধনা
করিব জীবন-ব্রত।

ভুলে নিজ ভ্রমে বৃথা পরিশ্রমে
জীবন ফুরায়ে এল ;
না লভিনু ধন না সাধিনু পণ
দুকূল ভাসিয়া গেল।
এবে নহে সাধে পড়িয়া বিপদে
আবার তোমারে ডাকি ;
হয়ো না নিদয়া করো দাসে দয়া
ভক্ত বলে মনে রাখি।
তুমি ক্ষেমঙ্করি নিজে ক্ষমা করি
ভুলো না মায়ের মায়া ;
ক্ষমি অপরাধ পূরাইও সাধ
দিও দেবি! পদছায়া।

মহাদেবের বিলাপ

দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী

"রে সতী রে সতী"* কাঁদিল পশুপতি
— —
পাগল শিব প্রমথেশ।
— —
যোগমগন হর তাপস যতদিন
— —
ততদিন না ছিল ক্লেশ।
— —
শবহৃদি আসন শ্মশান বিচরণ,
— —
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।
— —
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর
— —
আশ্রমরতি-নিরবাণে ॥
— —
"রে সতী রে সতী" কান্দিল পশুপতি
— —
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরানে।
— —
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
— —
আশ্রমরতি-নিরবাণে।
— —
জলনিধি মন্থনে, অমৃত উছলিল,
— —
যত সুর বাঁটিল তাহে।

*(—) চিহ্নিত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারান্ত পদের অন্তেস্থিত অ উচ্চারিত হইবে।

—　　　　　　—
ভস্ম-ভকত হর,　　　　　হরষিত অন্তর,
—　　　　—
গ্রাসিল গরল প্রবাহে ॥
—　　—　　—
"রে সতী রে সতী"　　　কাঁদিল পশুপতি,
—　　—
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরানে।
—　　　　—
ভিক্ষুক বিষধর,　　　　হরষিত অন্তর,
—　　—
আশ্রমরতি-নিরবাণে।
—　　　　—
কারণবারিপরে　　　　হরি কমলাসন
—　　—
ঘৃণা করি যে ক্ষণ হেলে।
—　　　　—
নির্ঘৃণ ত্রিনয়ন　　　　আহ্লাদে সেইক্ষণ,
—　　—
শবপরি আসন মেলে ॥
—　　　　—
প্রীত কমলাপতি　　　　রতনবর-পাত্রে,
—　　—
নর-ভালে প্রীত গিরীশ।
—　　—
পুষ্পকবাহন　　　　বাসব সুরপতি,
—　　—
বৃষবর-বাহন ঈশ ॥
—　　　　—
"রে সতী অরে সতী,"　　কান্দিল পশুপতি,
—　　—
পাগল শিব প্রমথেশ।
—　　　　—
যোগমগন হর,　　　　তাপস যতদিন,
—　　—
ততদিন-বা ছিল ক্লেশ ॥
—　　—
ভিক্ষুক আছরম　　　　ঘুচিল অতঃপর,

তব সহ মেলন শেষ ;

— —

জটাধর শঙ্কর, নবসুখ পাগর

— —

পরিশেষ সংসারি-বেশ ॥

— —

হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত

—

দম্পতি পরিণয়-বাসে।

কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,

— —

দক্ষ-দুহিতা ছিল পাশে ॥

— — —

যোগ-ধরমপর গৃহস্থধরমে

— —

নিমগন এখন শম্ভু ;

— — —

পান-পিয়াসরত, সবহি আগম

— —

চারিবেদ সাগর অম্বু।

— —

রে সতী অরে সতী কাঁদিল পশুপতি,

— --

পাগল প্রমথেশ শম্ভু ॥

— —

কতবিধ খেলন, মুরতি-প্রকটন,

— —

ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা,

— —

থাকিবে চিরদিন হৃদিপটে অঙ্কন

— —

সেসব বিলসিত লীলা ॥

— —

কৃশা কেশিনীরূপে, রাজিলা যেইদিন,

— —

চারিহাতে বাদন ধরি,

—

শঙ্খ-ডমুর-বীণা নিনাদনে নাচিলে,

ত্রিভুবন চেতন হরি ॥

দ্রব হল বাসব, দেবী অমর সব

অদ্রব বিধি হৃষীকেশ।

বিসরিতে নারিব সেইদিন-কাহিনী,

সে কাল রবে চিতলেশ।

"রে সতী অরে সতী" কাঁদিল পশুপতি,

পাগল শিব প্রমথেশ ॥

সেই যোগ-সাধন কী হেতু ঘুচাইলে

ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।

কী হেতু তেয়াগিলি কেনই সমাপিলি,

সে সাধ একদিন পরে ॥

"রে সতী অরে সতী" কাঁদিল পশুপতি

পাগল শিব প্রমথেশ।"

যোগমগন হর তাপস যতদিন,

ততদিন না ছিল ক্লেশ ॥

নারদের বীণাবাদন

আনন্দ-গদগদ নারদ মাতিল।
তন্ত্রী তুলিয়া তার মার্জিত করিল ॥
মৃদু-মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি-স্ফুরণে।

সরিৎ প্রবাহিলা সুন্দর বাদনে ॥
রুনু-রুনু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।
ক্রমে গুরুগর্জন সপ্তমে ছুটিয়া ॥
মিশ্রিত নানাসুরে কভু উতরোল।
স্বর-সরিতে যেন খেলিছে হিল্লোল ॥
চেতন আজি যেন ঋষিবর হাতে।
বাণী ভাষিল ধ্বনি মধুর ভাষাতে ॥
রাগরাগিণী যত জাগ্রত হইল।
রূপ প্রকাশিয়া ত্রিভুবন বাজিল ॥
গ্রহ আদি ভাস্কর ছিল যত ভুবনে।
রোধিল নিজ গতি সংগীত শ্রবণে ॥
সুরলোক মোহিত মোহন কুহকে।
স্তম্ভিত বীণাপাণি সুরতান পুলকে ॥
কৈলাস-তামস বিরহিত নিমিষে।
মধুঋতু ভাতিল মনের হরিষে ॥
আনন্দে তরুকুল মঞ্জরী হাসিল।
আনন্দে তরু-ডালে বিহঙ্গ সাজিল ॥
শিবশিবাবাহন বৃষভ কেশরী।
চঞ্চল চিত উঠে হরষেতে শিহরি ॥
সে ধ্বনি পশিল শিবহৃদি ভেদিয়া।
জাগিল পশুপতি ঈষৎ চেতিয়া ॥
বববম্ শবদ নিনাদি সদানন্দ।
মেলিয়া ত্রিলোচন মৃদু-মৃদু-মন্দ ॥
নিরখিলা নারদে প্রমত্ত বাদনে।
বিহ্বল শঙ্কর ভকতের সাধনে ॥
সাদরে তুষি তাঁরে কাছে দিলা স্থান।
ভোর হইল ভোলা শুনে বীণাগান ॥

শিবকর্তৃক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপসারিত

ত্রিপদী পয়ার*

মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকাল ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল ॥

---

* প্রত্যেক পংক্তিতে তিন তিন পদ ; প্রথম দুই পদে আট অক্ষরের পর মধ্য যতি এবং শেষ পদের সর্বশেষ পূর্ণ যতি। শেষ পদ কিছু দ্রুত উচ্চারিত

বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর-ঘটা ভীম-জটা আকাশেতে উঠিল।
ছড়াইল জটাজাল দিকে-দিকে ছুটিয়া।
দীপ্ত যেন তাম্রশলা ভানুকরে ফুটিয়া ॥
হিমময় ধবলের গিরি যেন উঠেছে।
শূন্যপুরী শিরে করি বিশ্বপরে ধরেছে।
মৌলিদেশে কলকল তরঙ্গিণী জাহ্নবী।
ঝরিতেছে ঝরঝর শতধারা প্রসবি ॥
শশিখণ্ড ধকধক জ্বলিতেছে কপালে।
ত্রিনয়নে তিন ভানু জ্বলে যেন সকালে ॥
ব্রহ্ম-অণ্ড যেন খণ্ড মেরুদণ্ড পরিয়া।
বিশ্বনাথ ঊর্ধ্বহাত কৌতূহলে পুরিয়া।
ওঁকার তিনবার উচ্চারিয়া হরষে।
ব্যোমকেশ বিশ্বতনু ধীরে-ধীরে পরশে।
শ্বাসরোধ করি ভীম শুনিলেন অচিরে।
বিশ্ব অঙ্গ লুকাইল মহাকাল শরীরে ॥
একে-একে জগতের আবরণ খসিল।
চন্দ্র-তারা-রশ্মি মেঘ অভ্রসনে ডুবিল ॥
গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।
অনুক্ষণ অদর্শন মহাদেব-শোষণে ॥
স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব-অঙ্গে মিশিল ॥
ঘুরে-ঘুরে শূন্যপথে বিশ্বকায়া ধায় রে।
ঝড় যেন অরণ্যের পল্লবেতে ছায় রে ॥
জগতের আবরণ নিবারণ পলকে।
দাঁড়াইলা মহাদেব বিভাসিত পুলকে ॥
বিশ্বময় ঘোরতর অন্ধকার ঢাকিল।
শিবভালে প্রজ্বলিত হুতাশন জ্বলিল ॥
দাঁড়াইলা মহেশ্বর করপুট পাতিয়া।
ধরিলেন বিশ্বরাজ পরমাণু তুলিয়া ॥
গরাসিলা বীজমালা গণ্ডুষেতে শুষিয়া।
দাঁড়াইলা মহেশ্বর হুংকার ছাড়িয়া ॥
মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশূন্য ভবনে।
শূন্যময় ব্যোমগর্ভ নীল অভ্রবরণে ॥
অতি স্বচ্ছ পরিষ্কৃত পারদের মণ্ডলী।
ছড়াইয়া আছে যেন দিক্‌চক্র উজলি ॥

ভবদেব বিশ্বকায় আবরণ খুলিয়া।
কহিলেন নারদেরে "হেরো দেখো চাহিয়া ॥"
ব্যোমকেশরূপ ত্যজি মহাদেব বসিল।
মহাঋষি চমকিত পুলকেতে পূরিল ॥

মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড

লঘুভঙ্গ পয়ার

মহাঋষি নিরখিলা কালিকার জগতী।
মহাশূন্যে ঘুরিতেছে ভয়ংকর মুরতি ॥
দলমল-টলমল আপনার ভ্রমণে।
দুলে যেন চক্রনেমি অতি দ্রুত গমনে ॥
হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ঘুরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা
আপনার বেগে স্থির মেরুদন্ড উপরি।
স্রোতোরূপে খেলে তাহে বেগহারা লহরী ॥
সচেতন-অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি কীট প্রাণীকায়া জনমে সে কল্লোলে ॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপী মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে ॥
অঙ্গ হতে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করালবদনা কালী নৃত্য করে হুংকারে ॥
ঘুরে-ঘুরে শূন্যদেশে বিশ্বকায়া ফিরিল।
বিভীষণ চিত্র এক নেত্রপথে ধরিল।
অন্তহীন হিমরাশি হিমালয় আকারে।
ধবলের চূড়া যেন ধু-ধু করে তুষারে ॥
নিরখিলা মহাঋষি বিথারিত নয়নে ।
প্রলয়ের ঘোর বহ্নি হিম দহে দহনে ॥
খণ্ড হয়ে হিমরাশি চণ্ডমূর্তি ধরিয়া।
ভীমশব্দে পড়িতেছে মহাশূন্যে খসিয়া ॥
ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন কালান্তের নিনাদে।
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ পুরী কাঁপে শবদে।
প্রতিধ্বনি ঘনঘোর মহাকাশে ছুটিল।
দশদিকে দশ বিম্ব ঘন-ঘন দুলিল ॥

মহালক্ষ্মী

ললিত দীর্ঘ ত্রিপদী

আনন্দে হৃদয় ভরি দেবঋষি বীণা ধরি
তারে-তারে মিলাইয়া ঝংকার তুলিলা ॥
নিবিড় রহস্য-সুধা পানে জুড়াইয়া ক্ষুধা
মধুর সংগীতস্রোতে মহাঋষি ডুবিলা ॥
ছুটিল বীণার স্বর ছুটিছে যেন নির্ঝর
হৃদয় প্লাবন করি সুগভীর বাদনে।
প্রকৃতির আদি লীলা ভবে কেবা নিরখিলা
মহাঋষি গাইলেন বিকশিত বচনে ॥
"জগৎ অশুভ নয় কালেতে হইবে লয়
জীবদুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।
এই কথা বুঝে সার আনন্দে নিনাদ তার
সত্যপথে রাখি মন অনাদ্যের স্মরণে ॥
লিখি বুকে মোক্ষনাম পূরা জীব মনস্কাম
'নিখিল নিস্তার পাবে' শিব কৈল আপনি।
লক্ষ করি তারি পথ চল নিত্য মনোরথ
জীবজন্মে ভয় কী রে?—জগদম্বা জননী।
ডাক বীণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক রে আনন্দভরে
নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে।
সকলের মূলাধার সকল মঙ্গল সার
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে ॥
জড়-জীবে দেহ-মন যা হইতে প্রকটন
অনুক্ষণ সেই রূপ হৃদিমাঝে জাগা রে।
পাই যেন পুনরায় পূজিতে সে রাঙা পায়
জগৎ মধুর করি তারা নাম শুনা রে!" ॥

ভারত-ভিক্ষা

(আরম্ভ)

কী শুনি রে আজ পূরি আর্যদেশ
এ আনন্দ-ধ্বনি কেন রে হয়?
ব্রিটিশ-শাসিত ভারত-ভিতরে
কেন সবে আজি বলিছে 'জয়'?
গভীর গরজে ছুটেছে কামান
জিনি বজ্রনাদ, গিরি কম্পমান
বিন্ধ্য-হিমালয়-চূড়াতে নিশান
'রুল ব্রিটানিয়া' বলি উড়ায়।
শত-শত-শত উড়িছে পতাকা,
ভুবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আহা,
নগরে-নগরে কোটি অট্টালিকা
শোভিয়া, সুচারু অনন্তকায়।
ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া,
অর্ণব-তরণী কেতনে সাজিয়া
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।
নদীনদকূল কেতনে সজ্জিত,
কোটি-কোটি প্রাণী পুলকে পূরিত,
বিবিধবসন-ভূষণে ভূষিত,
চাতকের ন্যায় তীরে দাঁড়ায়।
কন্যা-অন্তরীপ হতে হিমালয়
কেন রে আজি এ আনন্দময়?

(শাখা)

আসিছে ভারতে ব্রিটন-কুমার,
শুন হে উঠিছে গভীর বাণী;
গগন ভেদিয়া, "জয় ভিক্টোরিয়া
রাজরাজেশ্বরী, ভারতরানী।"

যেই ব্রিটানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া
অবাধে মথিছে জলধি-জল,
অসুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল ;
সে ব্রিটনবাসী আসি এ ভারতে
কামানে জ্বালিল বজ্রের শিখা,
যার দর্পতেজ ভারত-অঙ্গেতে
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা,
জিনিল সমর যে ভীম-প্রহরী
ক্ষত্রিয়রক্ষিত ভারত-গড়,
মুদকি, মুলতান করি খান-খান,
শিখ-গলে দিল দৃঢ় নিগড় ;
হেলায়ে তর্জনী লইল্য অযোধ্যা
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে,
প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে।
যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়,
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই ব্রিটনের রাজকুল-চূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তাঁয় জুড়াইতে আঁখি,
ভারতবাসীরা দাঁড়ায়ে পথে।

(পূর্ণ কোরস্)

রাজারে রে আনন্দে গভীর মৃদঙ্গ,
মুরলী মধুর সুর সারঙ্গ
বীণা পাখোয়াজ মৃদু করতাল,
মৃদুল এস্রাজ ললিত রসাল,
বাজা সপ্তস্বরা যন্ত্রী মনোহরা,
ভ্রমর গঞ্জিয়া বাজা রে সেতারা,
বেহাগ খাম্বাজে পূরিয়া তান।
ব্রিটনকুমার আসিছে হেথায়
সাজ পেসোয়াজে পরির শোভায়,
ভূতল-রঙ্গিণী মোহিনী যতেক,
কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক—

শুনাও বারেক মধুর সংগীত,
আজি এ ভারতে ভূপতি অতিথ,
তান-লয়-রাগে পূরাও গান।

(আরম্ভ)
চারিদিক জুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল ব্রিটিশ দামামা-কাড়া,
অর্ধ ভূমণ্ডল করি তোলপাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া—
"কোথা নৃপকুল-নবাব আমির,
রাজ-দরবারে হও হে হাজির,
করিয়া সেলাম নোওয়াইয়া মাথা
ছাড়ি সাচ্চা জুতা চুনি-পান্না গাঁথা
বিলাতি বুটেতে পদ সাজাও।
"জানু পাতি ভূমে হইয়া হরিষ
পরশি সম্ভ্রমে কুমার ব্রিটিশ,
বরাভয়প্রদ চারু করতল
তুলিয়া তুঙ্গেতে হইয়া বিহ্বল
অধর-অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।
"ভবে মোক্ষফল রাজ-দরশন,
ভারতে দেবতা ব্রিটন এখন,
সেই দেবজাত মহিষী-নন্দন
দরশনে পূর্ব-পাপ ঘুচাও।
"কোথা কাশীরাজ কোথা হে সিন্ধিয়া?
কোথা হোলকার রানী ভোপালিয়া
মানী উদিপুর যোধ মহীপাল?
হিন্দু ত্রিবাঙ্কুর শিখ পাতিয়াল?
মহাম্মদি রাজা কোথা হে নিজাম?
কোথা বিকানীর কোথা বা হে জাম?
ধোলপুর রানা ; জাঠের রাও?
"পরো শীঘ্র পরো চারু পরিচ্ছদ,
অর্ঘেতে সাজাবে আজি রাজপদ ॥
করো দিব্য বেশ হিরা-মুকুতায়,
ভারত-নক্ষত্র বাঁধিয়া গলায়
রাজধানী-মুখে ধাবিত হও।
"ঘোটকে চড়িয়া ফেরো পাছে-পাছে,
কিরণ ছড়ায়ে থাকো কাছে-কাছে,

ছায়াপথ যথা নিশাপতি-কাছে,
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও।
"করো রাজভেট নবাব, আমির,
রাজদরবারে হও হে হাজির—"
বাজিল ব্রিটিশ দামামা কাড়া,
করি তোলপাড় নগর-পাহাড়,
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

(শাখা)

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে
রাজেন্দ্র-কেশরী যত,
পরিষদ-বেশে দাঁড়াইতে পাশে,
শিরোগ্রীবা করি নত ;
দেখো রে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান
আফগানস্থান ছাড়ি,
ছুটিল কাশ্মীর ক্ষত্রিয় ভূপতি
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি ;
দ্রাবিড়, কঙ্কণ ভোট মালোবার,
মহারাষ্ট্র, মহীশূর,
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,
অযোধ্য, হস্তিনাপুর ;
বুন্দেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,
কচ্ছ কোঠা, সিন্ধুদেশ,
চাম্বা, কাতিয়ার, ইন্দোর, বিটোর,
অরবিল-গিরিশেষ,
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,
রাজধানী-দিকে ধায়,
পালে-পালে-পালে পতঙ্গের মতো
নিরখি দীপশোভায় ;
ছুটিল অশ্বেতে, রাজপুত্রগণ
চন্দ্র-সূর্য-বংশ-বীর।
জলধি—বন্দর, হিমাদ্রী ভূধর
দাপটে হয় অস্থির !
কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়
দ্বাপরে হস্তিনা-মাঝে।
রাজসূয় যজ্ঞ দেখো একবার
কলিতে করে ইংরাজে !

(পূর্ণ কোরস্)

অপূর্ব সুন্দর মোহন সাজ
সাজে কলিকাতা পরিল আজ ;
দ্বারে-দ্বারে-দ্বারে গবাক্ষ-গায়
রঞ্জিত বসন চারু শোভায় ;
দ্বারে-দ্বারে-দ্বারে গবাক্ষ-কোলে
তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;
ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্রকায়
ঝকঝক ঝলে কলস তায় ;
কোটি তারা যেন একত্রে উঠে,
সৌধ-চূড়ে-চূড়ে রয়েছে ফুটে ;
গৃহ, পথ, মাঠ কিরণময়—
নিশিতে যেন বা ভানু-উদয়।
উঠিছে আতসবাজি আকাশে—
সব তারা যেন গগনে ভাসে।
ধন্য কলিকাতা কলি-রাজধানী।
সুরপুরী আজ পরাজিলে মানি—
হ্যদে দেখো নিশি লাজে পলায়।

দেখো-দেখো-দেখো চতুরঙ্গ-দলে
বাজীপৃষ্ঠে সাজি, রানাপুত্র চলে ;
পাছে-পাছে কাছে ঘোটকপর
চলে রাজগণ জলে জহর
শির শোভা করি উজলি তাজ,
তবকে-তবকে পথির মাঝ,
নগর দর্শনে করে গমন,
ঝমকে-ঝমকে বাজে বাদন,
ব্রিটিশের ভেরী শমন-দমনে,
"রুল ব্রিট্যানিয়া, রুল দি ওয়েভস্"
সংগীত-তরঙ্গে নিনাদ ধায়।

(আরম্ভ)

উঠো মা উঠো মা ভারত-জননী
মহিষীনন্দন কোলেতে এল ;
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদ ঘুচিয়া গেল।
আদরে ধরো মা কুমারে সম্ভাবি

আশীর্বাদ-বাণী উচ্চারি মুখে,
বহুদিন হারা হয়েছ আপন
তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে ;
ত্যজো শয্যা, মাতঃ অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে
কেঁদো না, কেঁদো না আর গো জননী
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চিরদুঃখী তুমি চির-পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিত সদা,
তুমি মা অভাগী, অনাথা, দুর্বলা
ভজন-পূজন-যোগ-মুগধা!
মহিষী তোমার যাহার আশ্রয়ে
জগতে এখন(ও) আছ মা জিয়ে,
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাইতে
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে,
দেখাও জননী, ধরিলা গো যত
রিপু-পদ-চিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও চিরিয়া, ক্ষত বক্ষঃস্থল
দিবানিশি সেথা কী শোক জাগে।
উঠো মা উঠো মা ভারত জননী,
প্রসন্ন-বদনে বারেক ফের,
মহিষীনন্দনে কোলেতে করিয়া
প্রাতে শুক্রতারা উদিল, হের!

(শাখা)
ত্যজি শয্যাতল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গভীর পাণ্ডুর বদনমণ্ডল,
আলোক প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,
"কেন রে এখানে আসিছে কুমার?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার!
কী দেখিবে আছে—আছে কি সে দিন?
ভ্রূভঙ্গি করিয়া ছুটিত যেদিন
ভারত-সন্তান নৈঋত-ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা।
ভারত-কিরণে জগৎ কিরণ,

ভারত-জীবনে জগৎ জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন ষড়-দরশন—
ভারতের বেদ ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে পূজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, য়ুনানী-মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মানিক যথা।
ছিল যবে পরা কিরীট কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্যের শিরায়,
জ্বলন্ত অনল-সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি ;
ডাকিত যখন 'জননী' বলি
কেন্দ্রে-কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগৎ-মাতা!
পাব কি দেখিতে তেমতি আবার,
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,
ডাকিবে কুমার জননী বলিয়া,
ইউরোপ, আমেরিকা উচ্ছ্বাসে পূরিয়া,—
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা!
পূর্ব-সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরিশেরও দেখি জীবন সঞ্চার।
আমি কি একাই পড়িয়া রব?
কী হেন পাতক করেছি তোমায়?
বল ওরে বিধি বল রে আমায়?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হব।
হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী!
করিল যখন বর্বরে দুর্গতি,
ছিন্ন কৈল তোর কীর্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ, নাট্যশালা,

গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হতে যেন মুছিয়া নিল।
মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ,
কক্ষ, বক্ষঃ, ভালে পদাঙ্ক-স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ নিকেতন,
রাখিয়া মহীতে কলঙ্ক-মণ্ডিত,
কাশী, গয়াক্ষেত্র চণ্ডাল ঘৃণিত,
(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল।
হায় পানিপথ দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হলিনে অন্তর?
কেন রে, চিতোর তোর সুখ-নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেন রে রহিলি
জগতে ঘৃণিত ভারত নাম?
নিবিছে দেউটি বারাণসী তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক-ঘোর,
লেপিয়া শরীরে এখন রয়েছ
পূর্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ!
আরে অগ্রবন, সরযূ পাতকী
রাহু গ্রাস-চিহ্ন সর্ব-অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম?
নাহি কি সলিল, হে যমুনে-গঙ্গে,
তোমাদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,
কর অপসৃত এ কলঙ্করাশি,
তরঙ্গে-তরঙ্গে অঙ্গ-বঙ্গ গ্রাসি,
ভারত-ভুবন ভাসাও জলে?
হে বিপুল সিন্ধু করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আশ্রয়?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল জলে?"

(পূর্ণ কোরস্)
কেঁদো না কেঁদো না, আর গো জননী
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,

আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল,
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে
এ শোক সহিয়ে আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে,
ত্যজো শয্যা মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না—কেঁদো না আর গো জননী
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।

(আরম্ভ)

"এল কি নিকটে—এল কি কুমার?"
বলিল ভারত-জননী আবার,
"কই, কোথা বৎস, আয় কোলে আয়,
অন্তর জ্বলিছে দারুণ শিখায়—
পরশি বারেক শীতল কর,
ডাক একবার, ডাকিস যেভাবে
আপনার মায়ে ঘুচা সে অভাবে—
শতবর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
(ভারতের চির-আশা-আকিঞ্চন)
ভুলিয়া বারেক ব্রিটিশ-গর্জন,
ভারত-সন্তানে ক্রোড়েতে ধরো।
কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি করো ;
নহে তুচ্ছ কীট—এদের অন্তর
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান শক্তিময়—
এদেরও শরীরে শিরায়-শিরায়
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা তৃষ্ণায়
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে ;
এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্বে যবে,
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি দেব-গান
অসাড় শরীরে পাইল পরান,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া,
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে-শিখরে জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে,
সমর-হুংকারে কাঁপিত অনল,
নক্ষত্র-অর্ণব-আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে ;
যখন জৈমিনি, গর্গ, পাতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল বীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তো
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হ্যস্থে,
তখন(ও) তাহারা ঘৃণিত নহে।
তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব-গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনি নাচায়,
সেই পূর্ব পানে কভু গর্বে চায়—
এ জাতি কখনো জঘন্য নহে ;
হে কুমার মনে রেখো এই কথা,
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা,
পবিত্র সে দেশ—পূত কলেবর
কোটি-কোটি প্রাণী ঋষি পুণ্যধর
কোটি-কোটি জন শূর-বীর-নর
কবি কোটি-কোটি মধুর অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে।
শুনো হে রাজন! বনের বিহঙ্গ—
পুষিলে তাহারে যতনের সঙ্গে,
পিঞ্জরে থাকিয়া সেই সুখ পায়!
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়!
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ ;
কোকিলের স্বরে জগৎ তুষ্ট,
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট?
কী ধন বলো সে কোকিলে দেয়,

কী ধন বলো বা বায়সে নেয়?
একে মিষ্টভাষা—হৃদয় সরল,
অন্যে তীব্র স্বর পরানে গরল,
ধরা চায় সরল হৃদয়-রস।
আমি বৎস তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।
কী কব কুমার হৃদি-বক্ষ ফাটে
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখো দিবানিশি নয়ন ঝরে!
ব্রিটিশ-সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিংবা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পূজিব সবারে।
এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছ্য রে আমার,
ভারতসন্তানে লয়ে একবার,
ভাই বলে ডাক হৃদি জুড়ায়।
দেখো বৎস, দেখ কী উল্লাস আজ,
নিরখি তোমারে এ ভুবনমাঝ,
কোটি-কোটি প্রাণী করি উর্ধ্বহাত
বলিছে সঘনে আজি সুপ্রভাত—
তপ্ত অশ্রুধারা নয়নে ধায়।
ফিরিবে যখন জননী-নিকটে,
বলো বাছা তাঁরে বলো অকপটে
ভারত-ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী এককালে
ডাকে তাঁর নাম প্রাতঃ-সন্ধ্যাকালে,
তাদের পরান যেন জুড়ায়!"

(শাখা)
বলিয়া ভারত মুছিয়া নয়ন,
তুষি আশীর্বাদে মহিষী-নন্দন
ঢাকিয়া বদন অদৃশ্য হয়।

(পূর্ণ কোরস্)

ভারতে আজি রে বিরাজে কুমার
ভারতে অরুণ উদিল আবার,
বাজিল ব্রিটিশ শিঙ্গা ঘনে-ঘনে,
"জয় ভিকটোরিয়া-কুমার জয়!"

ভারত-বিলাপ

ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল,
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল,
মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে ;—
কোথা বা সুন্দর ঘন কলেবর
সিন্দূরে লেপিয়া রাখে থরে-থর,
কোথা ঝিকি-ঝিকি হিরার ঝালর,
যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে।
সোনার বরণ মাখিয়া কোথায়
জলধর জ্বলে, নয়ন জুড়ায়,
আবার কোথায় তুলারাশিপ্রায়
শোভে রাশি-রাশি মেঘের মালা।
হেনকালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে,
হেরি মনোহর সে তট-উপরে
রাজধানী এক, নব শোভা ধরে
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা।
দ্বিতলা, ত্রিতলা, চৌতলা ভবন
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র গঠন
গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায়।
অদূরে দুর্জয় দুর্গ গড়খাই
প্রকাণ্ড মুরতি, জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই ;
চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায়!
গড়ের সমীপে আনন্দ-উদ্যান,
যতনে রক্ষিত অতি রম্যস্থান
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান,
নয়ন, শ্রবণ, তনু জুড়ায়।

জাহ্নবী-সলিলে ওদিকে আবার
দেখো জলজান কাতারে-কাতার
ভাসে দিবানিশি—গুণবৃক্ষ যার,
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায়।
ওহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা
অলকা জিনিয়া হেন মনোহারা
কার রাজধানী, কী জাতি ইহারা,—
এ সুখ-সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।
নাহি যদি জান এসো এইখানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়।
অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে-শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রিটনবাসীরা—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়?
হায় রে কপাল, ওদেরি মতন,
আমরাও কেন করিতে গমন,
না পারি সতেজে—বলিতে আপন
যে দেশে জনম যে দেশে বাস।
ভয়ে-ভয়ে যাই, ভয়ে-ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়া ফুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস।
কী হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন
তখনি সে সাধ গিয়াছে ঘুচে।
সাজে না এখন অভিলাষ করা
আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে ধরিয়া দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে।
হায়, বসুন্ধরা, তোমার কপালে,
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে-কালে
বিদেশির পদে জীবন গোঁয়ালে
পূরাতে নারিলে মনের আশা।

রূপে অনুপম নিখিল ধরায়,
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি হেন দশা।
হায় রে বিধাতা কেন দিয়াছিলি
হেন অলংকার ; কেন না গঠিলি
মরুভূমি করে অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হত না তায়।
তাহলে এখানে করিত না গতি
পাঠান-মোগল-পারস্য দুর্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়!
এই যে দেখিছ পুরী মনোহর
শত গুণ আরো শোভিত সুন্দর,
এই ভাগীরথী করে থর-থর
যাইত তখন কতই সাধে।
গায়িত তখন কতই সুস্বরে,
এইসব পাখি তরু শোভা করে,
কতই কুসুম পরিমলভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে।
আগেকার মতো উঠিত তপন,
আগেকার মতো চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে গ্রহ-তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ধরিয়া ধরা।
যখন ভারতে অমৃতের কণা
হত বরিষণ বাজাইত বীণা
ব্যাস-বাল্মীকি বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা।
যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীররসে
হিমালয়-চূড়া গগন পরশে
গায়িত যখন ভারত নাম।
ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে-ঘরে
গাইত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ মহিমা পুলকিত স্বরে
জগতে ভারত অতুল ধাম।

ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল
এ হেন ভূভাগ করে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল—
তোমার তেজের নাহি উপমা।
এখন কিঙ্কর হয়েছি তোমার
মনের বাসনা কী কহিব আর?
এই ভিক্ষা চাই করো গো বিচার
অথর্ব দাসেরে করো গো ক্ষমা।
দেখো চেয়ে দেখ প্রাচীন বয়সে,
তোর পদতলে পড়িয়ে কী বেশে
কাঁদিছে সে ভূমি পূজিত যে দেশে,
কত জনপদ গাহে মহিমা।
আগে ছিল রানী ধরা-রাজধানী
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুঃখিনী
বলিয়ে দম্ভ কোরো না মহিমা!
তোমারো তো বুকে কত শত-বার
রিপু পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কী হবে আবার—
এই কথা সদা করিও না ধ্যান!
ভয়ে-ভয়ে লিখি কী লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বাণী-ঝংকার,
বাজিত গরজে—উথলি আবার
উঠিত ভারত ব্যথিত প্রাণ।

ভারত-সংগীত

(ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে-ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে-নগরে এবং পর্বতে-পর্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত
সংগীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্বত্র প্রচলিত এবং অন্যান্য গায়কেরা দেশে-দেশে এই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারত-সংগীত লিখিত হইয়াছে।)

"আর ঘুমাইও না দেখো চক্ষু মেলি
দেখো-দেখো চেয়ে অবনীমণ্ডলী,
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতূহলী,
বিবিধ-মানব জাতিরে লয়ে।
মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখো হে ধাইছে অকুতোভয়ে।
কোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশ্রয়
হয়েছে অধৈর্য নিজ বীর্যবলে,
ছাড়ে হুংকার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।
মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপূজিতা
চির-বীর্যবতী বীর-প্রসবিতা,
অনন্তরে বিনা যুনানী-মণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।
আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকি,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কী?
চীন, ব্রহ্মদেশ, নবীন জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!
বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"
এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলি,
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা।
আয়তলোচন উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু সন্ন্যাসীর ঠাট
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,

নয়নজ্যোতিতে হানিল বিজলি,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।
নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্যাবর্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা?
ধিক্‌ হিন্দুকুলে। বীরধর্ম ভুলে
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে
সোনার ভারত করিতে ছার।
হীনবীর্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
হ্যাদে দেখো ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার!
এসেছিল যবে আর্যাবর্তভূমে
দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব-পিতৃগণ
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা কজন ছিল?
আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে
যমুনা, কাবেরী, নর্মদা পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ী রণে,
তখন তাহারা কজন ছিল? .
এখন তোরা যে শতকোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন ছার,
পারিস শাসিতে হাসিতে-হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

তবে ভিন্নজাতি শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস সকলে?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হতে করিস না মন?
ওই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন-দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক শোভা করে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্যাবর্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশনসম
হিন্দু-বীরদর্প বুদ্ধিপরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর-জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?
সকলি তো আছে সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা!
হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!—
আর কি ভারত সজীব আছে?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে।"
এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে,
"এখন(ও) জাগিয়া উঠো রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবি-কর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে
করো দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।
জপ-তপ আর যোগ-আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর-কৃপাণে করো পূজা।
যাও সিন্ধুনীরে ভূধর-শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন-তন্ন করে,
বায়ু-উল্কাপাত-বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে
প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।
ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্যসিদ্ধি হত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সেদিন নাহিকো রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোলো তরবার,
এসব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ—
তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।
কীসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞানবুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও।
ওই দেখো সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন-দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্যাবর্ত এখন(ও) বিস্তৃত
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সেই জাহ্নবী-বারি এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?
বাজ রে শিঙ্গা বাজ রে রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

ভারত-কামিনী

ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া—সদাচার?
হয়ে আর্যবংশ অবনীর সার—
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?
এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া,
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিয়া মাতা-সুতা-জায়া,
এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?
বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি-রাশি,
অনাথা করিয়া গলে দিয়া ফাঁসি,
কাড়িয়া লয়েছ কবরী-কঙ্কণ,
হার, বাজু, বালা, দেহের ভূষণ ;
অনন্ত দুঃখিনী বিধবা নারী
দেখো রে নিষ্ঠুর হাতে লয়ে মালা
কুলীন কুমারী অনূঢ়া-অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে
অসংখ্য রমণী পাগলিনী-বেশে
কেহ বা করিছে বরমাল্য দান,
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ,
নয়নে ম্রিছিয়া গলিত বারি।
চারিদিকে হেথা ভারত জুড়িয়া
সরসীকমল যেন রে ছিঁড়িয়া—

কামিনীমণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া
কোমল হৃদয় করেছ হতাশ,
না দেখিতে দাও অবনী-আকাশ,
করে কারাবাস জগতে রয়ে।
আরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া সদাচার?
হয়ে আর্যবংশ অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?
এখন(ও) ফিরিয়া দেখো না চাহিয়া
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া—
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে।
দেখো না কি চেয়ে জগৎ উজ্জ্বল
এই সে ভারত হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী যমুনার জল
সিন্ধু-গোদাবরী-সরযূ সাজে।
জান না কি সেই অযোধ্যা-কোশল,
এইখানে ছিল কলিঙ্গ-পাঞ্চাল
মগধ-কনৌজ—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে?
এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা,
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী, সুশীলা
খনা, লীলাবতী প্রাচীনা মহিলা
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে ;
এই আর্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল
ধরিয়া কৃপাণ কামিনীসকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিঃশঙ্কহৃদয়ে ছুটিত সমরে
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া
সমর-উল্লাসে অধৈর্য হয়ে।
কোথা সে এখন অসিভল্লধারী
মহারাষ্ট্র-বামা রাজোয়ারা নারী
অরাতি বিক্রমে পরাজিত হলে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে

পতি-পিতা-সুত সংহতি লয়ে।
বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা-কিরণে জগৎ ভাতিল,
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ
আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে।
আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরা
বিজয় নিনাদে বসুন্ধরা ভরা
আর কি আছে মনের উল্লাস
জ্ঞানের মর্যাদা সাহস বিভাস
সেসব রমণী কোথা রে এবে?
সেদিন গিয়াছে পশুর অধম
হয়েছে ভারতে নারীর জনম
নৃশংস আচার নীচ দুরাচার
ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার
পিশাচের হেয় হয়েছে সবে।
তবে কেন আজও আছে ওই গিরি
নাম হিমালয় শৃঙ্গ উচ্চে ধরি?
তবে কেন আজও করিছে হুংকার,
ভারত-বেষ্টিয়া জলধি দুর্বার?
কেন তবে আজও ভারত-ভিতরে,
হিন্দুবংশাবলী শুনে সমাদরে
ব্যাস-বাল্মীকি? বারিধারা ঝরে,
সীতা-দময়ন্তী-সাবিত্রী রবে?
গভীর নিনাদে করিয়া ঝংকার
বাজ রে বীণা বাজ একবার
ভারতবাসীরে শুনায়ে সবে।
দেখো চেয়ে দেখো হেথা একবার
প্রফুল্ল কোমল কুসুম আকার
যুনানী মহিলা হয় পারাপার
অকূল জলধি অকুতোভয়ে!
ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে,
কানন, কন্দর-উন্নত গিরিতে
অপ্সরা আকৃতি পুরুষসেবিতা
সাহিত্য-বিজ্ঞান-সংগীতে ভূষিতা
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে।

আরাক ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার
পেয়ে নিজ মান পরি নিজ বেশ
জ্ঞান-দম্ভ-তেজে পূরে নিজ দেশ,
বীর-বংশাবলী প্রসূতি হবে?
এ হেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে
নাহি কিরে কোনো বীরাত্মা বিরাজে,
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড-খণ্ড,
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে।
চৈতন্য-গৌতম নাহি কিরে আর
ভারত সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার?
ঋষি বিশ্বামিত্র রাঘব পাণ্ডব,
কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সেসব,
ভারত যদি না উন্নত হবে?
ধিক হিন্দুজাতি হয়ে আর্যবংশ
নরকণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস!
ভুলে সদাচার দয়া সদাশয়,
কর আর্যভূমি পূতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী-মাঝে।
দেখ না কি চেয়ে জগৎ উজ্জ্বল,
এই সে ভারত হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে?
জান না কি সেই অযোধ্যা-কৌশল,
এইখানে ছিল কলিঙ্গ-পঞ্চাল?
মগধ কনৌজ—সুপবিত্র ধাম,
সেই উজ্জয়িনী—নিলে যার নাম,
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হয়ে?
এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা,
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী, সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে।
ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া, সদাচার,
হয়ে আর্যবংশ অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?

এখন(ও) ফিরিয়া দেখো না চাহিয়া,
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনও রয়েছ—উন্মত্ত হয়ে?

ভারতে কালের ভেরী

[১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে]

(১)

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার!—
ওই শুন ঘোর ঘন ভীম নাদ তার!
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে, আকুল অধীর বঙ্গে,
উঠিছে পূরিয়া দিক প্রাণী হাহাকার!
বাজিল অকাল-ভেরী বাজিল আবার!

(২)

চলেছে প্রাণীর কুল হেরো চারিধার;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির-বালক-নারী, হা অন্ন হা অন্ন বারি,
বলিতে-বলিতে ধায় চক্ষে নীরধার!
ধরাতলে চলে ধীরে কালির আকার!

(৩)

দেখো রে চলেছে আহা শিশু কতজন,
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী-বদন;
আকুল জননী তার, মুখ চাহি বার-বার,
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ!

(৪)

হেরো দেখো পথিধারে বসিয়া ওখানে,
পতির চরণে লুটি আকুল পরানে
বলিছে কামিনী কেহ, "কই নাথ অন্ন দেহো,
কালি আর চাহিব না রাখো আজ প্রাণে"—
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

(৫)

ছুটিছে যুবতী কন্যা ফেলিয়া পিতায়:
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ সকলি বৃথায়!

কেবা কন্যা কেবা পিতা, কে জননী কেবা মাতা,
অন্নদাতা পিতা-মাতা আজি বঙ্গালয়—
হেরো হেন কতজন আজি এ দশায়!

(৬)

হেরো কতজন আহা উদর-জ্বালায়—
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়,
তুলিয়া যুগল পাণি, শিশু ডাকে মা-মা বাণী
ক্ষুধায় জননী তার ফিরি না চায়—
একাকী পড়িয়া শিশু পরানে শুকায় ॥

(৭)

চলেছে প্রাণীর কুল এরূপে আকুল,
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল,
নৃত্য করি ভেরী-নাদে কঙ্কাল তুলিয়া কাঁদে,
খর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখো বঙ্গবাসী দেখো মূর্তি কী ভীষণ!

(৮)

ছুটিছে নয়নে বহ্নি স্ফুলিঙ্গ-সমান,
ফিরিছে উন্মত্ত ভাব উল্কার প্রমাণ ;
দন্ত-ঘরষণে শব্দ, ভারতভুবন স্তব্ধ,
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান,—
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান।

(৯)

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ-আলয়,
নন্দিনী-নন্দন-রূপ সুখপুষ্পময়,
আজি পূর্ণ কলরবে, অচিরে নীরব হবে,
শকুনি-বায়স কিংবা পেচক-আশ্রয়—
ধরিবে শ্মশান-বেশ মৃত অস্থিময়।

(১০)

কত সে জনতাপূর্ণ পণ্যবীথি হায়,
এ রাক্ষস অনাচারে হবে মরুপ্রায়।
ভীষণ গহন সাজ, ধরিবে পুরীর মাঝ,
পূরিবে বনের গুল্ম পাপ লতায়।
ভ্রমিবে শার্দূল-শিবা আনন্দে সেথায়।

(১১)

আজি হাসিভরা মুখ প্রফুল্ল যেসব,
আজি সুখপূর্ণ বুক আশার পল্লব,

কালি আর নাহি রবে, শবদেহ হবে সবে,
শৃগাল-কুক্কুরে মিলি করিবে উৎসব—
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব।

(১২)

কেমনে হে বঙ্গবাসী নিদ্রা যাও সুখে?
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে না কি দুখে?
নিজ সুত-পরিবার, না জানিছে অনাহার
ভাবিয়ে না চাহ কি হে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি-শোকের শেল বিন্ধে না কি বুকে?

(১৩)

প্রিয়ে বলি গৃহে আসি ধর যবে কর,
হয় না উদয় কি রে হৃদয়-ভিতর,—
কত সতী অনাথিনী, পথে-পথে কাঙালিনী,
ভ্রমিছে হতাশ হয়ে ত্যজি শূন্য ঘর,—
নাহি লজ্জা-কুলমান, ক্ষুধায় কাতর।

(১৪)

ক্রোড়ে ধরি হের যবে কন্যা-পুত্রগণ,
ভাবিয়া জগৎ-মাঝে অমূল্য রতন—
কভু কি পড়ে না মনে, সেইসব শিশুগণে,
অন্ন বিনে মরে যারা করিয়া রোদন?
তাহারাও ওইরূপ নয়ন-রঞ্জন।

(১৫)

হে বঙ্গ-কুলকামিনী আর্য যতজন
জান যার পতি-পুত্র-পিতা সে কেমন—
ভাবি দেখো একবার, বদন সে সবাকার,
ঘরে যারা প্রাতঃসন্ধ্যা করে দরশন,
নিরন্ন, বিষণ্ণ পতি, জনক, নন্দন।

(১৬)

একদিন অনশনে দিন যদি যায়,
জান না কি বঙ্গবাসী কী যাতনা তায়!
আজি সেই অনশনে, দারুণ হতাশ মনে
লক্ষ নরনারী শিশু করে হায়-হায়।
তবুও চেতনা কি হে নাহি হয় তায়?

(১৭)

ভাবো ওহে বঙ্গবাসী ভাবো একবার
কী কাল-রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে দ্বার—

নাশিতে সে দুরাচার, ব্রিটনের হুংকার,
ব্রিটিশ-কেশরীনাদ শুন একবার,
ঘুমাও না বঙ্গবাসী, ঘুমাও না আর
ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।

যমুনাতটে

(১)

আহা কী সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল
সমীরণ মৃদু-মৃদু ফুলমধু বয়,
কল-কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল।
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরুশাখাপরে
নিরবিলি ঝিঁ-ঝিঁ ডাকে জগৎ ঘুমায় ;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে-দুলে জলে ভাসি যায়।

(২)

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরান
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর ওই পর্বত-উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।
কী সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

(৩)

ভাসায়ে অকুল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মুরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশীথে,

শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কী সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কী কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

(৪)

হায় রে প্রকৃতি-সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কী বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী-দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে-সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায়?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবারাতি
আবার নির্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?

(৫)

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে-ক্ষণে হল মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না।
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি কত কাঁদি প্রাণ জুড়াইল।
রজনীতে কী আহ্লাদ, কী মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

হতাশের আক্ষেপ

(১)

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে-বারে,
গগনমাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।
তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে।
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!

(২)

ওই আশা ওইখানে এই স্থানে দুইজনে,
কত আশা মনে-মনে কতদিন করেছি!
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি।
পরে সে হইল কার, এখন কী দশা তার,
আমারি কী দশা এবে কী আশ্বাসে রয়েছি।

(৩)

কৌমার যখন তার বলিত সে বারংবার,
সে আমার আমি তার, অন্য কারো হব না।
ওরে দুষ্ট দেশাচার কী করিলি অবলার
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হল না।

(৪)

লোক-লজ্জা-মান-ভয়ে, মা-বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।

(৫)

হারাইনু প্রমদায় তৃষিত চাতক-প্রায়,
ধাইতে অমৃত আসে বুকে বজ্র বাজিল—
সুধাপান অভিলাষ অভিলাষ(ই) থাকিল।
চিন্তা হল প্রাণাধার প্রাণতুল্য প্রতিমার
প্রতিবিম্ব চিত্রপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায় কী বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

(৬)

হায়, শরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল ,
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

(৭)

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে
থাকি পড়ে ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা ;
কী যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না।
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান-অপমান—
আরে বিধি তারে কি রে জন্মান্তরে পাব না?

(৮)

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হল,
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম।
ভাবিতাম আমি দুঃখে প্রেয়সী থাকিত সুখে
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চক্ষে দেখিলাম।

(৯)

এইরূপে চন্দ্রোদয়,　　গগন তারকাময়
নীরব মলিনমুখী ওই তরুতলে রে ;
একদৃষ্টে মুখপানে,　　চেয়ে দেখে চন্দ্রাননে
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে ;
কেন সে-দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে?

(১০)

সে দেখে আমার পানে,　　আমি দেখি তার পানে,
চিতহারা দুইজনে বাক্য নাহি সরে রে ;
কতক্ষণে অকস্মাৎ　　“বিধবা হয়েছি নাথ!”
বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে!

(১১)

বদন চুম্বন করে　　রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে,
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে-ধীরে বলে রে—
“ছিলাম তোমার আমি,　　তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।”
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!

কালচক্র

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া–
উন্নত গগন পরে
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতিঃ ধরিয়া!
মানবে দেখায়ে পথ
চলেছে তড়িৎবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ ভূমণ্ডল ভাতিয়া।
হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি
দেখো রে মানবজাতি
ছুটেছে তাদের সনে
আনন্দ-উৎসাহ-মনে
নিজ-নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।
চলেছে চাহিয়া দেখো
বোদ্ধা যোদ্ধা এক-এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্তি ধরিয়া।

জলধি, পৃথিবী, মেরু,
প্রতাপে হয়েছে ভীরু,
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।
চলেছে বুধমণ্ডলী
নরে করি কুতূহলী,
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা
ছিঁড়িয়া আনিছে তারা
শূন্য হতে ধরাতলে জ্ঞান-ডোরে বাঁধিয়া।
আকাশ-পাতাল গত
পঞ্চভূত-আদি যত
প্রকৃতি ভয়েতে স্রুত দেখাইছে খুলিয়া।
দেবতা-অসুরগণ
ক্রমে হয় নিদর্শন
ঈশ্বরের সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।
সরস্বতী কুতূহলা,
সাহিত্য-দর্শন-কলা
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া ;
কমলা অজস্র ধারে
ভাঙিয়া নিজ ভাণ্ডারে
ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।
কবিকুল কোলাহলে
মুখে জয়ধ্বনি বলে
উন্নতি তরঙ্গ সঙ্গে
ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,
স্বজাতি-সাহস-কীর্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।
ওই দেখো অগ্রে তার
পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসিজাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।
অস্থির বাসনাবলে—
স্থাপিত অবনীতলে
সমাজ শৃঙ্খলমালা নবসূত্রে গাঁথিয়া।
চলেছে রে দেখো চেয়ে
শতবাহু প্রসারিয়ে
অর্ধ সসাগরা ধরা অলংকারে ভূষিয়া।
আমেরিকাবাসীগণ
নদ-গিরি-প্রস্রবণ

জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।
ওই শোনো ঘোরনাদে
পুরাতে মানের সাধে
পুরুষিয়া মন্দ্রবেশে উঠিতেছে গর্জিয়া
বিনতা-নন্দনসম
ধরে নিজ পরাক্রম
দেখো রে আসিছে রুশ বসুমতী গ্রাসিয়া!
ইতালি উতলা হয়ে
স্ব-কিরীট শিরে লয়ে
আবার জাগিছে দেখো হুংকার ছাড়িয়া।
বিস্তারিয়া তেজোরাশি
দেখো রে ব্রিটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা,
মরুদ্বীপ সসাগরা,
যতদূর প্রভাকর কর আছে ব্যাপিয়া।
প্রকাশি অসীম বল,
শাসিছে জলধিতল,
শিরে কোহিনুর বাঁধা মদগর্বে মাতিয়া।
তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি?
শোভে কি নক্ষত্র ভাতি
উন্নত গগনপরে ধরাতল ভাতিয়া?
ছিল সাধ বড় মনে
ভারত(ও) ওদেরি সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া ;
আবার উজ্জ্বল হবে
নব প্রজ্জ্বলিত ভাবে
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।
জন্মিবে পুরুষগণ ;
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া।
সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর ;
একজন(ও) কাঁদে না রে পূর্বকথা ভাবিয়া।
এ ক্ষিতিমণ্ডলমাঝ,
আর্য কি রে নাহি আজ

শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।
সে সাধ ঘুচেছে হায়!
আয় মা জননী আয়,
লয়ে তোর মৃতকায়
মিটাই মনের সাধ মনে-মনে কাঁদিয়া।

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী?
যৌবনের সুধাময়ী সুধাতরঙ্গিণী?
এই কি সে করতল শিরীষ-কোমল,
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল?
এই কি সে প্রাণহারা চোরা প্রিয় আঁখি?
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধরে রাখি।
এই কি রে সেই তনু স্বর্ণ জিনি যার
লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে—এই সে আমার?
পালঙ্ক-উপরে নারী পার্শ্বদেশে বসি তারি
ধীরে কোন প্রৌঢ়জন বলে ;
অলকার কেশগুলি ধীরে-ধীরে করে তুলি
ঘরে দীপ ধিকি-ধিকি জ্বলে।

(২)

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলায়।
সোনার বিগ্রহে যদি পূজ একদিন
সেও রে পরশ-দোষে হয় রে মলিন!
হীরকে কাটিয়া কর চিক্কন দর্পণ,
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন!
কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে ;
পরশ বারেক তারে—তারো শোভা হ্রাসে!
সংসারের সুখপদ্ম নারীও শুকায় সদ্য
পুরুষের দরশ পরশে।
বলে আর ফিরে-ফিরে নেহারে-নেহারে ধীরে
নারী-আস্য নিদ্রার সরসে।

(৩)

প্রবেশি সংসারে যবে—কী সুখের কাল।
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ানো ছিল, জড়ানো তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে!
কিবা নিদ্রা কী স্বপন কিবা সে জাগিয়া,
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া,
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী লতায়,
ভেবেছিনু সমুদয় পৃথিবীর সুখময়
নবতরু রোপেছি আনিয়া।
সে নবীন তরু এই, হায় রে আমিও সেই
কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া!

(৪)

"কেন নাথ কেন-কেন" বলিয়া তখন
উঠিলা রমণী সেই ত্যজিয়া শয়ন ;
তুলিয়া পরিয়া গলে বিগলিত হার
বলে "নাথ হেরো দেখো এখনও বাহার,
চারাগাছে পাতা ছিল এবে ফুল তায়
ফুটেছে কেমন দেখো পাতায়-পাতায় ;
কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশা,
সেই তুমি সেই আমি সেই ভালোবাসা।
মন দিয়ে খেলো নাথ ফিরে হবে বাজি মাত
সেই খেলা আবার খেলিব,
সেই পুঁজি, সেই পণ, সেই প্রাণ, সেই মন,
প্রাণনাথ সকলি সে দিব।"

(৫)

"কী দিবি রে পাগলিনী, পাবি কী কোথায়?
সাধের বাগান ভাঙা চেয়ে দেখো হায়!
ছায়া করে ছিল তাহে যেই দুটি তরু,
বসিতাম তলে যার যবে ভার গুরু,
একটি তাহার হায়, সমূলে ভাঙিয়া
গিয়াছে কোথায় চলে সঙ্গিনী ছাড়িয়া।
বল্মীকেতে জরজর নীরস শরীর
সেও হায় গত-প্রায় বজ্রাহত শির!
রোপিনু যে এত সাধে, ফুল-তরু কাঁধে-কাঁধে

কটি তরু আছে বলো তার?
কটি বলো ফুটে আছে   দাঁড়াইলে কার কাছে
সেই ঘ্রাণ ছুটে পুনর্বার!

(৬)

পাগলিনী কোথা পাবি সে শোভা আবার?
সে ফুলের মধু, বাস, এখন আবার!"
"কোথা পাব? এসো নাথ দর্পণের কাছে,
দেখাই সে শোভা তব, এবে কোথা আছে!
কেন নাথ নাই কি হে?—এই তো সে সব
সেই চারু চাঁদমুখ, প্রাণের বল্লভ,
সেই তো অমিয়মাখা, এখন(ও) তোমার,
নয়ন, বচন, হাসি—দর্পণ মায়ার!
সেই বাহুলতা এই   অধরে সে তিল এই
তখনও যা ছিল নাথ, এখনও তো সেই ;
সেই আমি সেই প্রাণ,   হৃদয়েতে সেই গান,
তখন-এখন কই প্রভেদ তো নেই।"

(৭)

প্রভেদ কি নাই,—হায় হায় রে কপটী—
দেখো দেখি একবার নয়ন পালটি।
যৌবনের কুঞ্জবন কত ছিল তায়
সারী, শ্যামা, শুক, পিক পাতায়-পাতায়;
যতনে ডাকিলে কাছে হরিষে আসিয়া,
হৃদয়ে মাতায়, কোলে পড়িত লুটিয়া,
এখন(ও) কি সেই পাখি আছে কি সেসব?
সেইরূপে কাছে এসে করে কি সে রব?
কত উড়ে গেছে তার   উডুউডু কত আর,
কত হায় নীরবে বসিয়া,
অসুখে শাখীতে লুটে,   ডাকিলে আসে না ছুটে
কাঁদে বসি সংগীত ভুলিয়া।

(৮)

"এখন বাজে না আর সে কুহক-বাঁশি!
মোহিনী মায়ার মুখে—সকলি রে বাসি
নির্গন্ধ জগতে এবে, নির্গন্ধ হৃদয়,
বসন্তের বাসশূন্য ফণীর আলয়।
যা ছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে,
এখন ভিখারি কাচ না পাই কুড়ায়ে।

ভেঙেছে প্রেয়সী, সেই আশার আরশি,
হাসি, কাঁদি, খেলি বটে তবুও উদাসী।
"তবুও উদাসী নাথ, করো দেখি দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন!"
বলে তুলে আনি সুখে, রাখিল স্বামীর বুকে
পুনঃ মায়া নিগড়ে বন্ধন।

কামিনী-কুসুম

(১)

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে?
কোথায় এমন আর
কোমল-কুসুমহার
পরিতে-দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে?
কোথা হেন শতদল
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা শরমে?
বঙ্গনারী পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে?

(২)

কী ফুলে তুলনা দিব, বলো চুতমুকুলে?
কোথার এমন স্থল
খুঁজিলে এ ধরাতল
সেখানে এমন মৃদু-মৃদু ঝরে রসালে?
যেখানে এমন বাস,
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথলে!
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে?

(৩)

মধুর সৌরভময় ভাবো দেখি চামেলি
চালে কী অতুল বাস,
ফুল্লমুখে মৃদু হাস
তরুকোলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি।
কী জাতি বিদেশিফুল
আছে তার সমতুল,
রাখিতে হৃদয়মাঝে পরে চিত্তপুতুলি?
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি!

(৪)

কী আছে জগতে বেল-মতিয়ার তুলনা।
সরল-মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ
ভুলায় মুনির মন নাহি জানে ছলনা,
না জানে বেশবিন্যাস,—
প্রস্ফুটিত মুখে হাস,
অধরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবাসম কোথা পাব ললনা?

(৫)

কে দেয় বিলাতি 'লিলি' নলিনীতে উপমা?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।
বিধুর কিরণ-কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কী মাধুরী মরি তার কে বুঝে সে মহিমা?
কোথায় বিলাতি "লিলি" নলিনীর উপমা?

(৬)

"কী ফুলে তুলনা তুলি বলো দেখি চাঁপাতে?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ইরানি 'গুল,'
এ ফুলের সমতুল?
কোথা ফিকে 'ভায়োলেট' গন্ধ নাহি তাহাতে।
কী ফুল তুলনা দিতে আছে বলো চাঁপাতে?

(৭)

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে—
মালতী, কেতকী, জাতি,
বান্ধুলি, কামিনী পাতি,
টগর-মল্লিকা দাগ নিশিগন্ধা শোভে রে,
কে করে গণনা তার—
অশোক, আতস আর,
কতশত ফুলকুল ফোটে নিশি তুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ-মাঝারে!

(৮)

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরি!
লতায়ে-লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায়,
লাজে অবনতমুখী, তনুখানি আবরি ;
তাই এত ভালোবাসি,
মেঘেতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী
মরি কী অপরাজিতা নীলিমার লহরী!

(৯)

এ মাধুরী সুধারস কোথা পাব কুসুমে,
কোথায় এমন আর,
কোমল কুসুম-হার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে, আছে এ নিখিল ভূমে।
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা শরমে—
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে?

বিশ্বেশ্বরের আরতি

[আকারাদি দীর্ঘ স্বরবর্ণের প্রকৃতরূপ উচ্চারণ এবং অকারান্ত পদের শেষ 'অ' উচ্চারণ করা আবশ্যক]

জয় দেব জয় দেব জয় গিরিজাপতি
শিব, গিরিজা-পতি দাসে পালহ নিত্য,
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা করো হে ॥১
জয় দেব জয় দেব কৈলাস-গিরি-শিখরে
কল্পদ্রুম-বিপিনে শিব, কল্পদ্রুম-বিপিনে
গুঞ্জরে মধুকর-পুঞ্জে কোকিল কূজয়ে
কুঞ্জবন গহনে খেলয়ে হংসাবন ললিত
শিব, হংসাবন ললিত প্রসারি কলাপ-কলাপী
নাচয়ে অতি সুখিত ॥২
জয় দেব জয় দেবতব সুললিত দেশে মণিময় আলয়ে
শিব, মণিময় আলয়ে বসিয়া হর নিকটে
গৌরী অতি সুখিতা হেরি ভূষণভূষিত নিজ ঈশে

হেরি ভূষিতা নিজ ঈশে সেবে ব্রহ্মা আদি দেবতা
শিব, চরণ ধরি শিরসে॥৩
জয় দেব জয় দেব নাচয়ে সুরবনিতা হৃদয়ে অতি সুখিতা
শিব, হৃদয়ে অতি সুখিত কিন্নর করয়ে গীতি
সপ্তস্বর সহিত থই থই নাদয়ে মৃদঙ্গ
শিব, নাদয়ে মৃদঙ্গ তাংধিক তাংধিক তাং শবদে,
বীণা বাদয়ে অতি ললিত রুনুঝুনু রুনু রুন নিনাদে ॥৪
জয় দেব জয় দেব! রুনুঝুনু রুনুঝুনু রুনুঝুনু চরণে
শিব, নূপুর সমুজ্জ্বল ভ্রময়ে মণ্ডলে মণ্ডলে
শিব, মণ্ডলে মণ্ডলে তাং ধিক তাং তাং ধিকতা
চখচখ লুপুচুপু লুপুচ পুচখচখ তালধ্বনি করতালে
শিব, তালধ্বনি করতালে অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠ ঘন নাদে ॥৫
জয় দেব জয় দেব, নাদয়ে শঙ্খ নিনাদয়ে ঝল্লরি
শিব, নিনাদয়ে ঝল্লরি আরতি করয়ে ব্রহ্মা
বেদধ্বনি পাঠে ধরি হৃদি-কমলে
তব মৃদু চরণসরোজ অবলোকয়ে তব রূপ
শিব, অবলোকয়ে তব রূপ নিজ পরমেশ্বর জ্ঞানে॥৬
জয় দেব জয় দেব কর্পূরদ্যুতি গৌর
ধারণ আনন পঞ্চ শিব, আনন পঞ্চ
বিষ কণ্ঠে গ্রহিত সুন্দর জটাকলাপ
পাবকযুত ভাল, শিব, পাবকযুত ভাল
বাম বিভাগে গিরিজা তব রূপ অতি ললিত॥৭
জয় দেব জয় দেব ত্রিশূল বজ্র খড়গ
ধারণ পরশু শিব, ধারণ পরশু
পাশ বরাভয় অঙ্কুশ নাদয়ে ঘন ঘন ঘন্টা
মস্তকে শোভয়ে গঙ্গা উপনীত সুরতটিনী
শিব, শিরে উপনীত সুরতটিনী উপনীত পন্নগ
রুদ্রাক্ষালঙ্কৃত বরবক্ষে॥৮
জয় দেব জয় দেব মনসিজভস্মবিভূষিত অঙ্গ শিব,
ভস্মবিভূষিত অঙ্গ ত্রিতাপনাশন সাযুজ্যপ্রাপণ
ধ্যানে ধারণ করে যে ভকতে,
কবে যে ভকতে ধারণ শ্রুতিতে
এই তব বৃষভধ্বজ রূপ॥৯
ওঁ জয় দেব জয় দেব জয় জয় গঙ্গাধর হর
জয় শিব জয় গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা করো হে ॥১০
শিব শিব শম্ভো॥

বিশ্ববিদ্যালয়ে

(বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে)

(১)

কে বলে রে—বাঙালির জীবন অসার?
সৌরভে আমোদ দেখো আজ কিবা তার।
বাঙালির হৃদয়ের যতনের ধন,
তার মাঝে দেখো ওই দুইটি রতন,
রজনী করিতে ভোর উজলি গগন,
আশার আকাশে উঠি জ্বলিছে কেমন!
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে।

(২)

কী ফুল ফুটিল আজি বঙ্গের মরুতে
ফোটে কি রে হেন ফুল কোনো সে তরুতে?
কোন নদী, কোন হ্রদ, পাহাড় উপরে
ফুটন্ত কুসমু হেন আনন্দ বিতরে?
রে যামিনী তারা-হারা কিবা আভরণ
আছে বলো তার বুকে দেখিতে এমন?
এতদিনে বুঝিলাম সে নহে স্বপন,
ভারত-বিপিনে বীজ হয়েছে বপন।
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসী তুহারে!
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে!

(৩)

এতদিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস,
ঘুচিল হৃদয় হতে কালের হতাশ।
বাঙালির কামিনীর হৃদয়-কমলে
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে।
সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গ-নয়নী,
ছুটেছে যুবক সঙ্গে যুবতী রমণী।
পরেছে উপাধি-হার সুনীল বসন
সেজেছে অঙ্গেতে কিবা চারু দরশন!
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে।

(৪)

কবে রে দেখিব বলো এ বিপিনমাঝে,
আর(ও) হেন কুরঙ্গিণী এ মোহন সাজে?
সেদিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার,
নারী হবে পুরুষের জীবন-আধার?
গৃহরূপ কমলের কমলা-আকারে,
ছড়াইবে সুখরাশি চাহিয়া সবারে।
হবে কি সেদিন ফিরে যবে এ বাঙালি
অলকা পাইবে হাতে অভাগা বাঙালি!—
কী আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে,
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!

(৫)

হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন,
ওই বেশ ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙালির মেয়ে"
তারি মতো সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে।
বেঁচে থাকো সুখে থাকো চিরসুখে আর!
কে বলে রে বাঙালির জীবন অসার?
কী আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে?
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে!
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!

সাবাস হুজুক আজব শহরে

ছেলাম, টেম্পল চাচা, আচ্ছা মজা নিলে,
ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে মিউনিসিপাল বিলে।
ফ্যাকট বলি, শহর জুড়ে ভারী আড়ম্বর।
অ্যাকট জারি হবে নূতন পয়লা সেপ্টেম্বর।
বলিহারি সুবেদারি সুসভ্য কেতায়।
ভেলকিবাজি ইংরেজের হদ্দ মজা হায়!
ফুরায় আগস্ট নিশি একত্রিশা বাসরে।
শহরে পড়িল চব্বু, পর্ব ঘরে-ঘরে ॥

শয্যা ছাড়ি রাতারাতি না হইতে ভোর।
বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া, বেশ্যা করে সোর ॥
প্রাতঃকালে জারি হবে নূতন আইন।
ফ্রেম বাঁধা "ফ্রানচাইসে" নেটিব স্বাধীন ॥
কেরানি, কারিন্দা, ক্লার্ক, মুচ্ছদি দেওয়ান।
মোল্লা, মুদি, মিউনিসিপাল বেঞ্চে পাবে স্থান ॥
শহর খোঁড়া কালের কাটি নেটিব প্রজার হাতে।
দেখব জারি বাহাদুরি কল্য দিবা প্রাতে ॥
দর্প করে দুপুররেতে "ক্যান্ডিডেট" যত।
ব্যস্ত হয়ে বস্তা খুলে, সজ্জা করে কত ॥
বনেদি বাবুর বাড়ি টোটাবাতি জ্বলে।
গ্যাস লাইটে ফাইন আলো আধুনি মহলে ॥
উকিল এটর্নি মুদি পোদ্দারের ঘরে।
রেড়ির তেলে আলো জ্বলে, পিরান পোশাক পরে
খোশপোশাকে সজ্জা করি বাহাল তবিয়ত।
স্বর্ণ চাঁপা স্বরণ করেন, সভ্য তরিবত ॥
দুর্গা, কালী, শিব নাম শিকেয় তুলে রাখি।
সিদ্ধ হন ফুলকুমারী, কিরণ্ময়ী ডাকি ॥
বিল্বপত্র বিনিময়ে "বটন" হোলে আঁটা।
শ্রীমতীর কুন্তলের বাসি ফুলের বোঁটা ॥
হৃদ্দ জপ পদ্মমুখে গন্ধ শুঁকি সুখে।
মন্দ যান "মৌনী শিয়াল" হতে, ছাতি ঠুকে ॥
কোনো বা বাবুজি, বালা-সহিত বাগানে।
চক্ষু রাঙা, ওঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে ॥
চোগা, ঘড়ি, টুপি, টাকিয়া চাপকান!
গড়াগড়ি পায়ে ধরি, নাছোড় বিবিজান ॥
ছাঁদন-দড়ি বাহুলতা, ছেদন কঠিন।
বাবুজি ভয়েতে ভেকো বদন মলিন ॥
দুঃখ দেখে মায়াবিনী বাঁধন দিল খুলে।
টপ্পা গেয়ে তেরিয়ান উঠিলেন ফুলে ॥
রুমালে মুছিয়া মুখ ঝাড়িয়া চাপকান।
"দেহি পদ পল্লব"—বলিয়া প্রস্থান ॥
কোথাও কর্কশ কথা বিষম ব্যাপার।
কর্তাটি বলেন, "খেপি, তলব রাজার ॥
প্রত্যুষে হাজির যদি না হইতে পারি।
সর্বনাশ হবে, খেপি, পর্ব আজি ভারী ॥

দয়াল দাদা 'রয়াল' চড়ে যাচ্ছে কোরে জাঁক।
কমবকতি ওকত গেল, তক্ত যাবে ফাঁক ॥"
বলে, আঁচল খুলে একদাপটে পগার হল পার।
ঘোষজা খুড়ি অবাক ভবে ভোটের ব্যাপার ॥
পিরবাক্স, রামগোবিন্দ নব্য ভোটর যত।
"ফ্রানচাইসের" ফ জানে না হয় বুদ্ধিহত ॥
সারারাত্রি বসে জাগে ভোটের রগড়ে।
হদ্দ তরিব পায় মশার কামড়ে ॥
হগের হুকুম শক্ত, সমর যদি বয়।
চাবুকে করিবে লাল, সদা প্রাণে ভয়।
পরিবার-পুত্রকন্যা হাহাকার করে।
সাবাস হুজুক আজ আজব শহরে।
সবাই তুফান ভাবে ভয়ে হবুথুবু—
কবি বলে, "সাধন" বিনে সভ্যতা কি কভু?
* * * * *
"ভোটিং হলে" মিটিং এবার জোটে কত লোক।
কেহ গোরা, কেহ দুধে, কেহ কৃষ্ণ জোঁক ॥
বাঁকা টেরি, হাতে ছড়ি একমেটে গড়ন।
কামিজ আঁটা নধরবাবু নাগর কোন জন ॥
কেহ বা দোমেটে গাঁদা, কেহ ঘেঁটুরাজ।
মাথাছাঁটা মেহঁদি কেহ, কেহ শিমুল ভাজ ॥
গাড়ি-গাড়ি নামে বাবু বণিক কেরানি।
কাঁড়ি-কাঁড়ি কেন্ডিডেট ফ্রেন্ডের কোম্পানি ॥
কেহ চড়ে জুড়ি-ফেটিন কেহ আফিস-যানে।
কেরাঞ্চি কাহারো ভাগে কারো বা ঠনঠনে ॥
কেহ বা আড়ানি তোলা "ব্লাকবুটের" ছাল।
কারো শিরে "প্যারাসল" বিবিয়ানা চাল ॥
'এলবো' ঠেলে 'হলে' ঢোকে সেথো লয়ে সাত।
ইংরেজি-ধরনে গতি সাবাস ক্যাবাত ॥
'মার্চ' করে পিছে-পিছে, 'ভোটর' টায়ারা।
আগে-আগে যষ্টিধারী ফুলিস পাহারা ॥
কেঁদে বলে হুঁসিয়ার ভোটর সে কোনো।
ছেড়ে দাও দণ্ডবিধি কাণ্ড কী তা শোনো।
ঘরে আছে পাঁচটি ছেলে একা রোজগারি।
আমার ওপর বিনি দোষে 'পত্তর' কেন জারি?'
'ফরেন চিজ' চাই না বাবা ছেড়ে দাও যাই।

ঘরের খেয়ে, বনের মোষ, কী হেতু তাড়াই ॥
তার সঙ্গে অন্য কেহ বলে কিন্তু হয়ে।
যমের ঘরে আমাদের কেন যাও লয়ে ॥
আমির-উজির ওরা, কেহ না মানিব।
ওদের সাথে পারব কীসে আমরা গরিব ॥
ভোটের লড়াই এমনধারা আগে জানে কেটা।
তা হলে কি ধরা দিয়ে ভুগি এত লেটা?
কান্নাকাটি ঝটাপটি, কত করে সোর।
'হগের' পুণ্যে কত পিণ্ডি পুলিসের জোর ॥
'ব্যাটন' গুঁতোর চোটে তোলে ভোটের কলে।
মর্ম 'হিটে' চর্ম ফাটে, ভাসে ঘর্ম-জলে ॥
বার খাড়া দুই দল "হলের" দু-ধারে।
মধ্যস্থলে মধ্যবর্তী 'সাইন' হাঁকারে ॥
'ইলেক্টর' ক্যান্ডিডেট হবে জোঁকাজোঁকি।
পল্লীবাস ফ্রেন্ডদের গাত্র শুঁকাশুঁকি ॥
কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত এ সময়।
চতুর রসকরাজ চির-রসময় ॥
দেখিলে না চর্মচক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগৃহ-রঙ্গ ব্যঙ্গের বাজার ॥
কিছুকাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে।
'লিবার্টি'র জন্ম দেখে কলম নিতে কেঁচে ॥
সাজাতে কতই রঙ্গে নব্য তন্ত্র সং।
তসর, গরদ, গজে ঢালতে কত রং ॥
বলতে কেমন পাকাগোঁপে কলপ শোভা পায়।
বলিহারি জরির টুপি বুড়োর মাথায় ॥
ঝুঁটিদার মোড়াসার আহা কিবা ঘটা।
বায়াত্তুরে শিরে তাজ, কুরুক্ষেত্রছটা ॥
ঘুণধরা বনেদি বুড়ো শিরে ত্যাড়া টুপি।
লেস-বসানো বেলাক ক্যাপে ঝোলে সিল্ক থুপি ॥
অপরূপ শোভা, আহা বাবরি ছাঁটা চুলে।
শ্মশানশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভুলে ॥
সামলার সুকার্নিস, মোড়াসার ফের।
মোগলাই ধুনুচির মাথাধরা ঘের ॥
ব্ল্যাক হ্যাট, 'ফেল্ট' টুপি, বোম্বায়ে লণ্ঠন।
লাইনবাঁধা সারি-সারি 'জানই' কেমন ॥
বাঙালি বাবুর সাজ আমার চোখে বালি।
নকলে মজবুত বঙ্গ আসলে কাঙালি ॥

ফর্দ হাতে মধ্যস্থলে মধ্যস্থ দাঁড়ায়।
মেম্বর বাছনি হলে ব্যাটন হেলায় ॥
ভোটর ধরে "আস্ক" করে তুমি কারে চাও?
কোনো জন বলে, সাহেব ওইটি আমায় দাও ॥
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্তি বগলে যাহার।
এলেমভরা, "ডি এল" মারা পছন্দ আমার,
"রাইট" বলে "ব্যাটন" তুলে বাছন্দার চায়।
"ইলেকটর" অন্যজনে ইঙ্গিতে শুধায় ॥
সেজন বলে পরিপক্ক খাসা কালোজাম।
"নিগারকুলে" কালাচাঁদ ওইটি লেব হাম ॥
এক তুরূপে টেক্কা মেরে "ব্যোম" করে বসেছে।
"অম্বল" থেকে "অনারেবল" আর কে অমন আছে?
হেসে পুনঃ "অফিসার" "ব্যাটন" ধরে তুলে।
বৈষ্ণব ভোটর বলে মনের কথা খুলে ॥
আমি লব রাঙা ওইই মুরলী রসিক
রসভরা মুখখানি, হাসি ফিকফিক ॥
মাথা ঘুরে পড়ে হেরে নয়নের ঠার।
অমন সুন্দর ছেলে কোথা পাব আর?
বলিছে ভোটর কেন ওই যে ও সেরে।
ছাঁটা গোঁপ কাঁচা-পাকা ঘটা করে ফেরে ॥
দোহারা চেহারা খাসা, চোগা বুটিদার।
টাকার আণ্ডিল উটি 'ফন্ডের' ভাঁড়ার ॥
দানাদার দাতা তবু 'পর্স' নহে "লুস"।
ঈশপের উপন্যাসে ওই সে "গোল্ড গুস" ॥
গিনি কাটা খাঁটি সোনা আছে "টুরু রিং"।
দেখেশুনে নিতে হল, "দ্যাট ইজ দি থিং" ॥
কেহ বলে, আমি চাই ওই সুব্রাহ্মণ।
পাকা দাড়ি,—সাদা চুল ঋষিটি যেমন ॥
বিদ্যের জাহাজ বুড়ো, বৃদ্ধের নবীন।
খ্রিস্টানের মুখ পাত, চোখানো সঙ্গিন ॥
আমার পছন্দ ওই খ্রিস্টভেকধারী।
সাপোর্টে দিলাম ভোট, জিতি আর হারি ॥
"হোর্রা" দিয়ে হেনকালে, ঢোকে দেখি "হল।"
ভঙ্গিতে বুঝিনু তারা উকিলের দল ॥
চমকে চমক ভাঙে "টিল্ট' হতে নামি।

"এনট্রান্স" আটক করে দাঁড়াই গিয়ে আমি ॥
সকলের আগে এক মর্দ দিল সাড়া।
দিগগজ ছ-হাত যেন তালের কাঁড়ি খাড়া ॥
আদ্‌পাকা চুলেতে তেড়ি, বুরুশে বাগানো।
"পারফিউমে" ভরা কেশ রুমালে ছড়ানো ॥
সখের প্রাণ, সাদাসিদে, বলছে যেন হাসি।
"দেলদারিতে" খ্যাতি আমার আর সকল বাসি ॥
"সেকেন" করে ছাড়ি তারে অন্য কথা নাই।
হিরে বাঁধা হৃদয়খান ওইটি আমি চাই ॥
এবার টিকিট হেরে হাসি নাহি ধরে।
লেখা তাতে গোটা-গোটা ছাপার অক্ষরে ॥
গণিত গায়ক, গাড়ি "চটকে মসুর।"
হিন্দুয়ানি হেকমতে হদ্দ বাহাদুর ॥
বারো মাসে তের পর্ব বাই খেমটা নাচ।
"হেলথ" ভালো চিরকাল ঢালাই করা ছাঁচ ॥
রাষ্ট্র জুড়ে "ফাস্ট" খ্যাতি, ডঙ্কা মারা নাম।
সর্বঘটে অধিষ্ঠান বর্ণচোরা আম ॥
দুই "পাস" একেবারে শূন্যেতে উত্থান।
এইবার রক্ষা করো মুশকিল আসান ॥
দুই বাঙালে এক সঙ্গে "হলে' যেতে চায়।
কারে রাখি কারে ছাড়ি পড়ি ঘোর দায়।
এক বাহাদুর 'হন্ধে' ভারী বঙ্ক ফাঁপা পেট।
হাল্কা দেহ কঞ্চিকাটি অন্য ক্যান্ডিডেট ॥
ছিপছিপে বাঙালবাবু রাগেতে ফোঁপায়।
নুদোপেটা ভুঁদো দাদা মজবুত কথায় ॥
রাকাড়ে-রাকাড়ে ওঠে কোন্দলের ঝড়।
হাঁকাহাঁকি-চেঁচাচেঁচি বেহদ্দ বেগড় ॥
বিধকুটে বাঙালে গোঁসা বড়ই বালাই।
আহেলি বেলাতি বোল আনকোরা ঢাকাই ॥
গরম-গরম আচ্ছারকম ইংরেজি ফোড়ন।
ভাসছে তাতে সাধু ভাষা মিষ্ট বিলক্ষণ ॥
ভোটিং গেল ভ্যাস্তা হয়ে 'ফ্রেনসিপ কুল।'
কবি বলে দুজনাই 'ডাউন্ রাইট ফুল॥"
'অনর' বজায় কত্তে হলে, ঘুসি সাফাই চাই।
'ভালগার' ব্যবস্থা কেন কথার লড়াই?
আলিপুর জুড়ি জুড়ি-গাড়িতে ছয়লাপ।

চোপদার, চাপরাশি, ভৃত্য, কটিকসা ছাপ ॥
পেগম্বর জমিদার, খোস্ক রদি রাজা।
সিল্ক সাটিন, গরদ, চেলি চাপকানেতে ভাঁজা ॥
গলবস্ত্র সেক্রেটারি সাহেবানে ঘেরে।
'পাইমেন্ট' পাস পাইতে দ্বারে-দ্বারে ফেরে ॥
কেহ বলে খোদাবন্দ দুই লক্ষ আয়।
কেহ বলে "ভারত-তারা" আমার গলায় ॥
কেহ বলে আমার 'ফনে' ব্যাঙ্ক খাড়া আছে।
কেহ বলে 'ফ্যামিন ফনে' অনেক টাকা গেছে ॥
"মা-বাপ" সাহেব তুমি রক্ষা করো মান।
নৈলে ঘরে ফিরে গেলে বোঁচা হবে কান ॥
অতি বৃদ্ধ পিতামহের খেলাত তুলে কেহ।
বলে সাহেব সবার আগে আমায় পাস দেহো ॥
কেহ বলে কৃষ্ণদাস আমার প্রতিবাসী।
খোদাবন্দ ফেল কল্লে পাড়াসুদ্ধ হাসি ॥
মৌলভি বলেন আমি মুসলমানের চাঁই।
হুজুর যেন ইয়াদ থাকে, বান্দার দোহাই ॥
নবাব বলেন আমি নমুদি উজির।
হকিয়তে আমার হক ভিদ ভি হাজির ॥
ফেসাদ করে, কত সেধে মাথা কুটে কেঁদে।
একে-একে ফেরেন সবে জয়পত্র বেঁধে ॥
বাঙলায় বন্দনীয় যত অবতার।
বলিহারি বঙ্গবাসী তারিপ তোমার ॥
* * * *
নগর ভিতরে হেথা নাগরীর হাট।
নবীন তরঙ্গে তুলে করে কত নাট ॥
বাছনি 'ভোটিং হলে' নাচনি পাড়ায়।
ব্যঙ্গভরা বামাসুরে শ্রবণ জুড়ায় ॥
বিবিয়ানা তেড়িকাটা তরুণ-তরুণী।
তেফেরা শাড়িতে বেড়া গাজের উড়ানি ॥
'রুজ' মাখা মুখখানি পাখা নিয়ে হাতে।
গরবে গজেন্দ্রগতি ঘুরিছেন ছাতে ॥
উদ্দেশে কাহারে বলে ভালো বুকের পাটা।
মিউনিসিপেল কমিশনার হবে আবার সেটা ॥
মেগের হাতে রাঁড়া রুলি পেগের বড়াই খালি।
বাগিচা-বাগান-বোট নাই একটি মালী ॥

সে আবার হতে চায় ভোটের মেম্বার।
পোড়া কপাল কালামুখ, ধিকধিক ছার ॥
বাড়ির নিকট ছাতে শাড়ি কালাপেড়ে।
আঁচলে চাবির থোবা ঝোলে গলা বেড়ে ॥
বসিয়া জনক বামা 'উলেন' বিনায়।
সিঁথিতে সিন্দুর-ছটা চাঁদের শোভায় ॥
শুনে কথা মরালের মতো মাথা তুলে।
বলে হায় হাসি পায় যম আছে ভুলে ॥
কড়িতে কি জোটে মান বড়িতে খিচুড়ি।
গুড়েতে কি খাজা হয় এক আঙুলে তুড়ি ॥
আংটি ঘড়ির চেন বানরে কি সাজে?
আমার ভাতার হলে পালাতাম লাজে ॥
হরপের এক অক্ষর যার পেটে নাই।
সে হবে মেম্বর? তার মেগের মুখে ছাই ॥
কোনো গবাক্ষের কাছে রমণী আহ্লাদে।
লক্ষ করি অন্যজনে কথা কহে ছাঁদে ॥
কিপটে ভাতার কেয়াকাটা কুমড়া বলিদান।
মুখমিষ্টি মধুপর্ক সকলি সমান ॥
সে বলে তলানি জানি পুরুষ বড় দাতা।
লম্বা কোঁচা পরের কাছে ঘরে ছেঁড়া কাঁথা ॥
বললে—পালটা গেয়ে আলতামাখা পা দুখানি তুলে
আয়না ফেলে জানলা দিয়ে চলল খোলা চুলে ॥
কবি কহে ফিমেল বাছাই হয় যদি কখন।
বাছুনির বাহাদুরি দেখাব তখন ॥
পোলিং শেষে হাজরে ডাকা পরক ভারী দড়।
বাছাই করা মেম্বরেরা কাউন্সেলে জড়ো ॥
কাগজ হাতে হগ বাবাজি হাকিম ধরন।
একে-একে ডাকেন সবে ত্যাড়া উচ্চারণ ॥
নবাব নমুদ আলি খানসামা গোলাম।
রায় রাজেন্দ্র শ্রীরাম যুগি? উত্তর—সেলাম ॥
কুমার ভেকেন্দ্র কৃষ্ট কানাই নাজির।
সাহেবজাদা সেকেন্দর! উত্তর—হাজির ॥
নাপিত নদেরচাঁদ পদ্ম বাহাদুর,
ছিদাম মালি শ্রীধর মুচি?—হাজির হজুর ॥
রামভদ্র চেতলঙ্গী নবি বরকন্দাজ।
অনারেবল শিষ্টদাস?—"গরিব নমাজ ॥"
প্যাগম্বর 'সি এস আই' পরেশ তৈনত।

শ্রীরাম মন্তপি 'হায়'?—"সাহেব দণ্ডবৎ ॥"
মৌলভি তাল্লিম মিয়া, ইন্দ্রের পিয়ালি।
ঘড়েল সাবুই বাগ?—হাজির হুজুরালি ॥
ডিপুটি নফর বক্স সৈয়দ নবিস্তে,
যো হুকুম শির প্যাঁচা?—আপ কি ওয়াস্তে।
হল্লা দিয়ে ছুটল পাছে তারুই মাছের ঝোল।
হাক্‌রে ডেকে সাহেব গেল, যাত্রাভঙ্গ গোল ॥
কোলাকুলি-গলাগলি 'সেকেনের' ধুম!
মিউনিসিপেল মজা দেখে, আক্কেল গুড়ুম ॥

হায় কী হল

(১)

হায় কী হল?—কলম ছুঁতে হাসি এল দুখে।
ভেবেছিলুম মনের কথা লিখব ছাতি ঠুকে!
এল হাসি—হাসিই তবে ঢেউ খেলিয়ে চলে।
ছটাকখানিক রসের কথা—"হায় কি হল" বলে!

(২)

হায় কী হল দেশের দশা রিপন রাজার ভুরে?
সাদাকালো সমান হবে—সবার মুণ্ডু ঘুরে ॥
আসল কথা রইল কোথা কেউ না সেটা খোঁজে।
কথার লড়াই কথার বড়াই—হওয়ার সঙ্গে যোঝে ॥
সফেদ-কালা মিশ খাবে না—সমান হওয়া পরে।
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুললে উঁচু করে।

(৩)

হায় কী হল—পেটের কথা বেরিয়ে গেল কত।
ইস্তক সে লাট টমসন—বেরাল ইন্দুর যত—
"রাষ্ট করে বলে দিলে গুপ্ত প্রেমের কথা" ॥
উচ্চপায়া, নেটিভদিগের সেটা কথার কথা ॥
ধর্মভীতু এদেশীয় তাদের ভিতর ছিল।
স্পষ্ট কথা বলে দিয়ে—"পুরস্কারী দিল" ॥

(৪)

হায় কী হল—কত লোকের ভ্রমটা গেল ঘুচে।
বিলেত-ফেরা এ দেশিতে প্রভেদ নাইকো ছুচে ॥

যতই বলুন, যতই শিখুন, তাদের চলন-চাল—
ইংরেজরা ভোলে না তায়—হায় রে কলিকাল!

(৫)

হায় কী হল—কপাল পোড়া উমেদারের পেশা।
পড়ল চাপা জাতার তলে—সাহেব বড় গোঁসা ॥
অন্ন গেল বাঙালিরই, আর কী হলো তায়!
এ পোড়া ছাই "ইলবার্ট বিল" কেন হায়-হায়!

(৬)

হায় কী হল—দেশের দশা বিলেতে গেলে রমা।
তিনদিন না যেতে-যেতে খ্রিস্ট ভজে, ও মা!
পুরুষ পাছে মেয়ে আগে সুফল তাতে ফলবে না।
চাই এ দেশে, আর কিছুদিন এ "দিশি জানানা ॥"

(৭)

হায় কী হল—কথার দোষে সুরেন গেল জেলে!
ইংলিশম্যানে "কনটেম্পট" ও "সিডিসন"ও চলে ॥
আহেল বেলাত নরিস্ সাহেব ধর্ম অবতার।
দেশের ছেলে খেপিয়ে দিয়ে কললে একাকার ॥
ফিনকি ছুটে ভারত জুড়ে আগুন গেল লেগে।
হায় কী হল—ছেলেগুলো পুলিশ দিলে দেগে!

(৮)

হায় কী হল?—বঙ্গদেশের কপাল গেল ফিরে!
গুলি পুরে গোরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাকপুরে!
আসছে সুরেন ঘরে ফিরে এই কথা সাদা।
এতেই এত আড়ম্বরি? ইংরেজ কি গাধা?

(৯)

বোঝে যারা "হায় কী হল"—তাদের কাছেই বলি।
"ন্যাশানেল ফনের" ব্যাপারটা নয় কি ঢলাঢলি?
পরের অধীন দাসের জাতি "নেশেন" আবার তারা!
তাদের আবার "এজিটেশন"—নরুন উঁচু করা ॥

(১০)

হায় কী হল—দলাদলি বাধল ঘরে-ঘরে।
পার্টি-খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত রাজ্যপরে ॥
সবাই "লিডর"—কর্তা স্বয়ং—আপনি বাহাদুর।
কতই দিকে তুলচে কত কতই তরো সুর!

(১১)

হায় কী হল—অকাল এল আবার ধ্বজা তুলে।
রাজার পুণ্যে প্রজার কুশল—লেখাই আছে মূলে!

হায় কী হল তাদের আবার—অন্ন যাদের ঘরে?
জমিদারের গলা টিপে স্বত্ব চুরি করে।
"টেনেন্সিবিল" নামে আইন হচ্ছে তৈয়ার করা।
গয়া-গঙ্গা-গদাধর ভূস্বামী প্রজারা।

(১২)

হায় কী হল—বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম দেছে ছেড়ে,
হায় কী হল—দেশটা গেছে "সাপ্তাহিকে" জুড়ে!
হায় কী হল—ভূদেব গেল ছেড়ে গুরুগিরি।
হায় কী হল—হেম, নবীনের, নাইকো জারিজুরি।

(১৩)

সবার চেয়ে হায় কী হল—ওই যে হাসি পায়,
"হেস্টি-পিগট" মিষ্টি কথা—"মিস্টিরি" তলায়!
কী কাণ্ডটা ছি-ছি ছি-ছি "ন"জ্জার কথা বড়!
পাদরি হয়ে উদয় দলে—রগড় এত দড়?

(১৪)

হায় কী হল—আধখানা মাঠ জুবার্ট নেচে ঘেরে!
বিষয়টা কী, বুঝতে নারি কাণ্ডখানা হেরে!
আদ্দেক বাড়ি শহরমাঝে হচ্চে মেরামত ;—
শুনতে ভালো "একজিবিশন"—একজনার কিসমত।
দেশের শিল্পী কারিগুরি শিখবে বিলাতিরা—
অন্নাভাবে দু-দিন বাদে মরবে এদেশিরা?
হাসব কত—"একজিবিশন" দেশের ভালো করে?
খেতে অন্ন নাইকো যাদের—এ কি তাদের তরে?

(১৫)

হায় কী হল দাঁড়াই কোথা?—ইংরেজে-ই‌ংরেজে,
তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে—সবাই মল্লসাজে!
বলচে যত "কলোনিরা" আমরা হিস্যে চাই,
'অস্ট্রেলিয়া' ভাগ বসাবে অন্য কথা নাই!
এ দিশি ইংরাজ যত বাঁধছে সবাই দল,
রাখবে ভারত নিজের হাতে—দেখিয়ে বাহুবল।
"ইংলিশম্যানের" ফরেল সাহেব কচ্চে—"কম্যান্ডারি,"
পেছন থেকে পাইওনিয়ার হাঁকচে হাওলদারি।
বাপ রে বাপ কী চেহারা "ভলন্টিয়ারগণ,"
দাঁড়িয়ে গেছে সাঙ্গিনহাতে—কাঁপচে কলাবন!
আর কি থাকে রানীর রাজ্য!—নীলকর, চা-কর,
সাঙ্গিন খাড়া দিচ্চে সাড়া—উঁচিয়ে হাতিয়ার!

ছেড়ে দিবে ছররা-ভরা—পাখি-মারা "গন্"—
উড়ে যাবে দু-লাখ সেপাই—আর্মি—"সেলর"-গণ!
তাই তো বলি "হায় কী হল"—রাজ্য আলমগিরি!
একেই বলে দেশোন্নতি—সাবাস বলিহারি!
বুঝবে যদি "হায় কী হল"—পয়সা কটি দিও,
যত্ন করে বঙ্গদর্শন কাগজখানি নিও।

"নেভার—নেভার"

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রানসন কেসুয়িক, মিলার—
"নেটিবের কাছে খাড়া নেভার—নেভার।"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের "জানানা"?
বিবিজান! দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না ॥
হিপ-হিপ-হিপ হুরে, হ্যাট-কোট-বুট পরে,
সরা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে?—নেভার—নেভার!
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা?"
দেহে প্রাণ বিবিজান! কখনো তা হবে না ॥

(২)

কাঁপিল মেদিনীতল, ধরা যায় রসাতল,
অস্ত্রে ফেলি উর্ধ্বশ্বাসে "ভলেন্টিয়ার" ছুটিছে,
কাগজ-কলম ধরে কামিনীরা উঠেছে!
হুরে-হিপ্ হুরে-হো শিঙে বাজে ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ—
ব্রিটন স্বাধীন সদা "ফ্রিডম—এভার।"

(৩)

বিলাতি বৃষের রব কামিনী খেপিল সব
বল্লভের কাছে গিয়া কানে দিল পাক,
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দভরে
ডাকিল ব্রিটিশ-বৃষ গাঁক-গাঁক ডাক ॥
হুরে-হিপ হুরে-হো, শিঙে বাজে ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ
ব্রিটন স্বাধীন সদা—"ফ্রিডম এভার।"

"নেভার"—সে অপমান,   হতমান বিবিজান
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "অজানা?"
দেহে প্রাণ, বিবিজান, কখনো তা হবে না ॥

(৪)

আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই   সিন্ধুপারে চলে যাই
সেখানে "লিবার্টি হল" আমাদের সভা।
পাত্র-মিত্র যতজন সকলেই গবা!—
বুঝাইব খাঁটি হাল   আছিলাম এতকাল
হিন্দুদেশে ভালোবেসে হিন্দুর সন্তানে,
সিংহ যেন মৃগ কোলে স্বর্গের উদ্যানে!!
লাথি-কিল পটাপট   জুতো-চড় চটাচট
"লিভার" পিলে ফটাফট আপনি যেত ফেটে।
আমরাই করুণায়   মলম মাখায়ে গায়
রাখিতাম কোলে করে হিন্দুর সন্তানে
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের বাগানে!
হুরে-হিপ হুরে-হো শিঙে বাজে ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ
ব্রিটন স্বাধীন সদা "ফ্রিডম এভার"।

(৫)

হুঁশিয়ার ইলবার্ট দেখো হে রিপন লাট—
সাহেব-রক্ষণী সভা সংগঠিত হয়েছে।
দুপোঁচ-তেপোঁচ মিলে,   লক্ষ টাকা দেছে তুলে,
চামড়া কাটা কতগুলা "এস্কিবিয়স" জুটেছে।—
হিপ-হিপ-হিপ, হুরে,   হ্যাট-কোট-বুট পরে,
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা?
আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই, সবরাঙা ডাকে সবাই—
সিন্ধুপারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।
পালে ঢুকে মিশে যাব,   আন্দ্রু-পিন্দ্রু নাহি রব,
সিংহদলে স্থান পাব বেছে নেবে কেবা।
হুরে-হিপ হুরে-হো, শিঙে বাজে ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ—
এ দিশি "ব্রিটন" মোরা গোরাদের ব্যাটা!

(৬)

"জয়-জয় ব্রিটনের"   জগৎ পেয়েছে টের—
ভারত উদ্ধার হবে আমাদের "মিশনে।"
সে বাসনা যত কাল,   পূর্ণ নহে তত কাল
আমরা থাকিব হেথা কী করিবে রিপণে?
ভারত উদ্ধার হবে, আমাদেরই "মিশনে।"

হিপ-হিপ হিপ-হুরে,　　　　হ্যাট-কোট-বুট পরে
বেড়াব শিকার ধরে যেথা পাব ভুবনে—
কী করিবে আমাদের "টেরেটর" রিপনে!
শত্রু যদি করে গোল,　　　　ধরিব বৃষভ বোল,
উচ্চতানে শুনাইব নিছক খেউড়।
সাবাস ইংরেজ জাতি　　　　সাবাস বুকের ছাতি,
লাঙুল বেঁধেছে ভালো সভ্যতা নেজুড়।
হুরে-হিপ হুরে-হো শিঙে বাজে ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ—
ব্রিটন স্বাধীন সদা "ফ্রিডম—এভার"
হুরে-হিপ—হিপ-হুরে,　　　　হ্যাট-কোট-বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার,
নেটিবের কাছে হবে?—"নেভার—নেভার"।

(৭)

কলরবে কুতূহলী নেটিবের দল।
জনবুলে দেখাইল শিংভাঙা কল ॥
দেখাইল বাড়ি-গাড়ি-জুড়ি বাছা-বাছা।
"ম্যাঙ্গো ফিশ" মনোহর আনন্দের খাঁচা ॥
ছড়া-ছড়া পরিপক্ক তাজা মর্তমান।
দেখিলে ইংরাজ যাহে সদ্য মুগ্ধপ্রাণ ॥
দেখাইল রত্নগর্ভা বাঙলার সুধা!
মাদ্রাজ-বোম্বাই দেশ চক্ষুমনোলোভা ॥
রত্নমঞ্চ "রেসিডেন্সি" দেখাইল কত,
জ্বলিছে ভারত জুড়ে মানিক পর্বত।
চলেছে তাহার তলে এ দেশি রাজারা,
পৃষ্ঠপরে শ্বেতকায় রানীর প্রজারা।।
হুরে-হিপ—হুরে-হো,　শিঙা বাজে ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ
ব্রিটন স্বাধীন সদা "ফ্রিডম—এভার ॥"

(৮)

হঠাৎ পড়িল ডাক সামাল-সামাল।
বলি শোন ওরে ভাই ইংরাজ ছাবাল।
এ রাজত্বি ছেড়ে আর কোথা যাবি বল?
চিরশিক্ষা ব্রিটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাব—টুট-টুট-টুট।।
ধূপছায়া ভায়ারা, সবে শোন তবে বলি,
আরমেনিয়া যাও হে কেহ—কেহ চুনাগলি ॥
স্পষ্ট কথা বলা ভালো বিঘ্ন বড় ভারী,

"মিলক কাউ" ইন্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি ॥
সবাই মিলে "অ্যা হেম" বলে পকেটপানে চায়,
উচ্চতানে ধীরে-ধীরে হাম্বা সুরে গায়—
হুরে-হিপ—হুরো-হো শিঙে বাজে ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ
ব্রিটন স্বাধীন সদা—"হেথা ফরেভার" ॥
হিপ-হিপ—হিপ-হুরে, হেথা ছেড়ে যাব ফিরে,
"ড্যাম দি নেটিব বিল" নেভার-নেভার!?

বাজি-মাত

বেঁচে থাকো মুখুজ্যের পো, খেললে ভালো চটে।
তোমার খেলায় রাং রুপো হয় গোবরে শালুক ফোটে
"ফ্রিব্রু" দানে, এক তাড়াতে, কললে বাজিমাত।
সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়!
দেখালে অদ্ভুত কীর্তি বকুলতলায়!
পুণ্য দিনে বিশে পৌষ বাঙলার মাঝে।
পর্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে ॥
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা?
মুখুজ্যের কারচুপিতে মুখ হৈলো ভোঁতা ॥
হরেন্দ্র-নগেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি।
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি ॥
ধন্য মুখুজ্যের বেটা বলিহারি যাই।
বস্তা দরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই!
ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস! একবার দেখো চেয়ে।
বকুলতলায় পথের ধারে কতশত মেয়ে—
কালো ফিকে, গৌর, সোনা হাতে গুয়া পান।
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান ॥
আসবে রাজপারিষদ, লাট সাহেবের মেয়ে—
মারবেল মারা গিলটি হল, একবার দেখো চেয়ে ॥
বেলগাছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন।
বিষ্ণুপুরে মিনসের দেখো বড়ে টেপার গুণ ॥
ছি রাজেন্দ্র, কাল কাটালে পুথি ঘেঁটে-ঘেঁটে।
শেষে, আইনপেশার পেসকারিতে মানটা গেল ঘেঁটে ॥
ধন্য হে মুখুজ্যে ভায়া বলিহারি যাই।

বড় সাপটা দরে মাত করিলে খেতাব "সি এস আই"
হেদে ও শরবাসী, আর কী হাসি হাসবে রেড়ো বলে
দেখো না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রানীর ছেলে ॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মেমসাহেব।
নাড়িটেপা ফেয়ার সাহেব বারলেট নায়েব ॥
আর কেন লো ঘোমটা খোলো কবির কথা রাখো।
"লাইট" পেয়ে রাইট" হয়ে পার হও লো সাঁকো ॥
ভয় কী তাতে, লজ্জা কী তায় কালো বদনখানি।
দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি ॥
কজ্জা তুলে দেখবে বাজু দেখবে কানের দুল,
দেখবে কুণ্ঠী, কণ্ঠহার পিঠের ঝাঁপাফুল ॥
আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণচাপ—
শিবের বিয়া নয় লো ইহা ধরবে নাকো সাপ ॥
এগিয়ে এসো বড় ঠাকরুন, সাত পোয়াতির মা।
তত্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না?
সোনার খারে হিরের মালা তাতে ঢাকাই ধুতি,
নজর দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিননো পুতি ॥
বাহবা বুক, বুড়ো বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে,
রাজপূজাটি কললে ভালো, ফুলের মালা নিয়ে ॥
কোন শাস্ত্রে লেখে বলো বামনের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে ॥
এখন—দাঁড়াও সবে বুড়ো দিদি, হাসিল হল কাজ।
দেখব আমি ভালো করে আর এয়োদের সাজ ॥
আয় না লো সব একে একে গোলাপি কাঞ্চন।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালি কেমন ॥
ভয় করো না একলা আমি দেখতে নাহি চাই।
রাজার ছেলের আবডালেতে উঁকি মারব ভাই ॥
আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কী লো তারে ॥
বলতে কথা বাছা-বাছা কদম ফুলের ঝাড়।
ঘেমে আসি রাজকুমারে ভাঙল কবির ঘাড়!
হিরার ঝলস, সোনার কলস, হাতঝুমকার বোল।
হুলু-হুলু উলুর ধ্বনি শাঁখের গণ্ডগোল?
বারাণসীর খসখসানি, উঠল মহাধুমে।
মারবেলেতে মলের ঠমক বাজল রুমে-রুমে ॥
কবি হৈল হতভোম্বা হিঁদুর পর্দা ফাঁক।

পালিয়ে যেতে পথ পায় না ঘোরে কলুর চাক ॥
বাঙলায় বিশে পৌষ বড় পুণ্যদিন।
বাঙালি-কুলকামিনী হইল স্বাধীন ॥
*　　*　　*　　*
সে নিশিতে কি শহরে কিবা পল্লীগ্রামে।
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে ॥
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাহাটি।
সারানিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি ॥
কহে কোন-রাজনারী বিনায়ে-বিনায়ে।
শয়ন গৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে ॥
খালি সাটিনের সাজ, ফেটিন হাঁকানো।
কেবল সেলাম বাজি, লেবিতে বেড়ানো ॥
দিন-রাত ঘুরে-ঘুরে মরেন কেবল।
ঘোড়দৌড়ে, টাউন হলে, মুড়িয়া মকমল ॥
ক্লাইব লাটের আমল হতে পেশা খোশামদি।
তাতেও গলদ এত—কী কব লো দিদি ॥
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি।
চাঁদা দিতে চাঁদি ফাটে মানের গুড়ে বালি ॥
শুনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান।
কর্তাটি জানালা খুলে স্নিগ্ধ বায়ু খান ॥
*　　*　　*　　*
অন্য কোনো অট্টালিকা ভিতরে আবার।
পতি-পাশে কোনো রমা করেন ঝংকার ॥
"পর্বটা কি শুনেছ তো লজ্জা নাই মুখে!
পোশাক খুলে চুপে-চুপে শুতে এলে সুখে ॥
রানীর ছেলে দেখে গেল হলুদ মাখা হাত।
সাত পুরুষে সভ্য মোরা হলেম গুদামজাত ॥
পড়তে পারি, বলতে পারি ইংরেজি ভাষায়।
পিয়োনো বাজাতে পারি ইংরেজি প্রথায় ॥
'এনলাইটেন' সবার আগে, কর্তা বিলাত যান।
তোমার গুণে, গুণমণি হারালে সে মান ॥
পায়ে বুট, জোব্বা গায়ে, গলায় সোনার চেন।
তক্‌মাওয়ালা আরদালিতে হন না শুধু ফেম ॥
বাপ-পিতামোর নামে খালি হয় নাকো রাজভেট।
'টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট চাই স্ট্রেট' ॥
ধিক তোমারে ধিক সে তোমার হিরান্ডরি বুক।

এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগিয়ে দিলে হুক ॥"
খোঁটা খেয়ে অধোমুখে পতি তার চায়।
এইরূপ গঞ্জনায় সারানিশি যায় ॥
*　　*　　*　　*
বলে কোন অনাঢ্যের অভিমানী নারী।
"বড় নাম, বড় জাঁক, বোঝা গেছে জারি ॥
দূর করে টেনে ফেলে টাকা দিও শয়ে!
এ হিড়িকে দাঁড়ালে না একটা কিছু হয়ে ॥
বাঁধা রোশনাই আলো সব কি গেল ফেঁসে।
রায়বাহাদুর নামটাও ছি, না পাইলে শেষে!
সুযোগ বুঝে হুজুগে বামুন নাম কললে জারি।
তোমার কেবল আতসবাজি মন্দ তুমি ভারী!"
*　　*　　*　　*
জজের গৃহিণী কন "ভ্যালা জালিয়াতি!
নামে শুধু অনারেবল, পদ বিলিয়াতি ॥
ছোটলাটের আজ্ঞাকারী তোমা হতে দেখি,
লক্ষ-লক্ষ বড়লোক বলো দেখি এ কী?
কুঠি নিলে বাড়ি ছেড়ে সাহেব পাড়ায়—
তোমার কোর্টের উকিল তোমাকে হারায়।
ছি, ছি, ছি, ছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরি!
শুধু খালি মার্কা-মারা পেয়াদার 'লিবরি' ॥
ভাবতাম বুঝি কেষ্টবেষ্ট তুমি একজন—
জরাসিন্ধু রাজা কিংবা লঙ্কার রাবণ!
ওমা-ওমা পোড়া ভাগ্যি, উকিলের ওঁচা!
হাড়জ্বালানে পড়েন খালি এনে নথির গোছা ॥"
বলে, ঠোনকা মেরে জজমহিলা বারান্দায় যান।
মিত্রভায়ার রাত্রি শেষ ভাঙাতে তাঁর মান ॥
পোনা-পুঁটি-খয়রা-চেলা গিন্নি আর যত।
পাড়ায়-পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত ॥
কেহ "বলে আমার কর্তাটি সে মুতশুদ্ধি।
ফ্যাটা বেঁধে যান খালি এই বিদ্যা-বুদ্ধি ॥
বাপের কামানো টাকা বিলাতি চাটকে।
দিয়া নিজে জুজু হয়ে ঢোকেন ফাটকে ॥
তাঁর টাকা তাঁর কড়ি তাঁরি লোকজন।
মাঝ থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন ॥
শেষে যবে হোমে যায় দু-বছর পরে।

বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে ॥
এই তো 'এলেম' তাঁর বিদ্যার ওজন।
তা হতে আমার আর কী হইবে বোন?"
  বলে দালালের মাগ "দালালি ব্যাপারে।
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ রোজগারে ॥
পেটেতে কড়িটি ভোর কালো আঁচড় নাই।
সে কেমনে রাজপুত্র আনে বলো ভাই ॥"
  কাগজের এডিটারি করে মরে যারা।
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে-কেঁদে সারা—
"রাত্রি-দিন এত খাটে হায় লো সাঙাত।
হপ্তায় মিনিট পাঁচ হয় না সাক্ষাৎ ॥
এত লিখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে।
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে ॥"
কবি বলে কামিনীরা কৃষ্ণনাম করো।
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর ॥
  ডিপুটির ভার্যা কন "আমাদের তিনি।
চৌকিদারির কাজে পটু, মফস্‌সলে "গিনি" ॥
শহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার।
বলব কী লো দিদি অদৃষ্ট আমার ॥
ঘুরে-ঘুরে দেশে দেশে শরীর হল কালি।
সাতশো টাকা মাইনে হল হদ্দ—ঠাকুরালি ॥
মন্দ বড় তবু এতে চোকরাঙানি কত—
ঘুঁটের ঢিপি ভাবে দিদি দেখিলে পর্বত ॥
হতাম যদ্যপি কোনো উকিলের মাগ।
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ ॥"
  সে রমণী বলে "বোন এপিট-ওপিট।
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট ॥
যে টাকাটি মাসে-মাসে করে উপার্জন।
চৌদ্দ ভূতে পড়ে করে অর্ধেক ভোজন ॥
কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজলাসে-এজলাসে।
দিন তেরটি লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে।
বেশ্যার বেহদ্দ পেশা কথা বেচে খায় ॥
পদের আবার মান-সম্ভ্রম কোথায় ॥
আমি উকিলের মাগ কথা শোন বোন।
মুখুজ্যের সঙ্গে আর করো না ওজন ॥"
"বটে বোন বটে-বটে মানি তোর কথা।"
বলে ধীরে-ধীরে এক নারী আসে সেথা ॥

"আমার কর্তাটি দেখো সরকারি উকিল।
মুখুজ্যের "সিনিয়র" উকিল সিবিল ॥
বয়েসও হয়েছে কিছু বুদ্ধিও পেকেছে।
ছোট-বড় কর্ম-কাজ অনেক করেছে ॥
পাকা হিন্দু, প্রতিদিন দুর্গা নাম করে।
তবুও রানীর ছেলে ঢুকল না লো ঘরে ॥"
ডাক্তারের নারী কহে "ভারী তো মন্দানি।
নাড়ি টিপে জারি কত ঘরেতে শাসানি ॥
পারেন কেবল পাড়ায়-পাড়ায় পিটিতে ধম্বল।
মরণকালে শরণ "চিবর" পার্টিজ সম্বল ॥
মরেন ঘুরে পথে-পথে রোদে ধুঁকে-ধুঁকে!—
ঘরে শুতে এলে এবার খেঙরা দিব বুকে ॥"
কেরানির নারী যত পাঁদাড়ে ফোঁপায়।
মাস্টারের "মিসট্রেসেরা" গোঁসাঘরে যায় ॥
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায় ॥
কান্তা আসি হাস্যমুখে বলে কই দেখি!
"কী পাইলে কাব্য লিখে সোনা কিংবা মেকি
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারা রাতি।
কালি ফেলে কাগজ ছিঁড়ে পুড়িয়ে মোমের বাতি ॥
শয়নে সোয়াস্তি নাই বিরাম নিদ্রায়।
সাত রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি বয়ে যায় ॥
দাও দেখি গুণমণি কী পেলে শিরোপা।
বুলুরিবন, চাকি-চাকতি, কিংবা জরির খোঁপা ॥"
কবি কহে পায় কিবা কী দেখাবে ধনি!—
না বলিতে রাঙা ঠোঁট ফুলায়ে তখনি ॥
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গরগরিয়ে যায়!
ফাঁপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল্-ফ্যাল্ চায় ॥

দেশলাইয়ের স্তব

নমামি বিলাতি অগ্নি দেশালাইরূপী,
দেহখানি চাঁচাছোলা শিরে বাঁধা টুপি।
যেমন ডেপুটি বাবু একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বেড় রাগে দেহভরা।

নমামি গন্ধক গন্ধ মুণ্ডটি গোলালো,
সর্বজাতিপ্রিয় দেব গৃহ কর আলো।
শান্ত সভ্য অতি ধীর—চাপে যতক্ষণ,
ধাপে উঠে চটে লাল—গৌরাঙ্গ যেমন।
নমামি সর্বত্রগামী দারু অবতার,
চৌর্য-বিঘ্ন-বিনাশন কুটুম্ব টীকার।
নিদ্রিতের গুপ্তচর পাচিকার প্রাণ,
লম্বাদাড়ি কাবুলির শিরে যার স্থান।
নমামি খদ্যোৎশিখা নয়নরঞ্জন,
লালেতে নীলের আভা দিব্যদরশন।
পোয়াতির প্রিয়সখা বালকের অরি,
বিরাজ হে কাষ্ঠদেব কত রূপ ধরি।
প্রণমামি জ্বালামুখ শুভ্র দেশালাই,
সাহেব গোলাম তব কী কব বাদশাই।
সোনা-টিন-রুপা-তামা গায়ে বাঁধা ফিতে,
লাটের পকেটে ওঠো লেডির ঝাঁপিতে।
নমামি সহজদাহ্য বরযাদমন,
আঁচড়ে কিরণ ধর সখের জ্বলন।
আখা জ্বলে বিনা ফুঁয়ে বিনাচখে জল,
দিয়াকাটি তোর গুণে মাগিরা পাগল।
নমামি কলির কীর্তি কাষ্ঠের চকমকি,
তোমার চমকে বিশ্বকর্মা গেছে ঠকি।
বিল, খাল, বন, জল, যেখানেই যাই ॥
শিরে ভাটা সদা শলা দেখি সেই ঠাঁই।
নমামি-নমামি দেব পাইন-নন্দন,
তোমার প্রসাদে হয় সাগরে রন্ধন।
সভ্য জগতের তুমি সোহাগের বাতি,
চুরুট-ভক্তের মোক্ষ পদার্থ বিলাতি।
নমামি ফর্ফরশব্দ নাসিকা পীড়ন,
ধনীর নিকটে তুচ্ছ কাঙালের ধন!
সন্ধ্যার সোনার কাটি জোছনার ছবি,
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ, ব্রাইয়ন্টের রবি।
নমামি কিরণদণ্ড কোপন-স্বভাব,
রাজগৃহে চালাঘরে সমান প্রভাব।
সিন্ধুজলে, পথে, মাঠে গাড়ি, ঘোড়া রেলে,
সকলে তোমায় পূজে সূর্য-শশী ফেলে।
ভিখারি কুটীরে সুখী, ভীরুতে সাহসী,

তব বলে খোঁড়া খাড়া বুড়িরা ষোড়শী।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি সাহস-তারণ,
দীনবন্ধু তব গুণ কে করে কীর্তন?
প্রণমামি খর্বদেহ অন্ধকারহারি!
নমামি অশেষ রূপ অবনী-বিহারি।
নমামি মোমের ডাঁটি "ফস্ফরে"তে মলা,
ঊনবিংশ শতাব্দীর অনলের শলা।
তব গুণে, গুপ্ত তাপ, তৃপ্ত জগজ্জন,
প্রণমামি দেশালাই দেবের ইন্ধন ॥

বাঙালির মেয়ে

কে যায়, কে যায়, ওই উঁকিঝুঁকি চেয়ে?
হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বুলে তামাকু রস—রাঙা রাঙা ঠোঁট;
কপালে টিপের ফোঁটা—খোপা বাঁধা চুল,
কেশেতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল,
বলিহারি কিবা সাটি দুকূলে বাহার,
কালাপেড়ে শান্তিপুরে কল্মে চুড়িদার,
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে চলে যেন ধেয়ে—
হায় হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে!
হায়-হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে—
মুখের সাপটে দড়—বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে কথার তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—পা ছড়ায়ে বসা,
আঁচলের খুঁটটি তুলে অমঙ্গলা ঘষা!
নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায় বেড়ানী,
পেটটিভরা কুজড়ো কথা, পরনিন্দাগ্লানি।
কথায় আকাশে তোলে হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ি চলে রাত্রি-দিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গীন,
খেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে—
হায়-হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে!

হায়-হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্তিমান, চারুপাত পড়া,

পেটের ভিতরে গজে দাসুরায়ের ছড়া।
চিত্রিকাজে চিত্রগুপ্ত—পিঁড়িতে আলপনা
হদ্দ বাহাদুরি—"ছিরি" বিচিত্র কারখানা,
অঙ্কশাস্ত্রে বররুচি-গ্যালিলো-নিউটান,
গণ্ডা কড়ি গুনতে হলে জ্ঞানের বাড়ি যান ;
পাণ্ডাড়ে পড়োর মতো অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ লেখা সাধ :
ক্ষীরপুলি, পায়েস, পিঠা মিষ্টান্নের সীমা,
বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা।
জলো দুধে পুষ্টদেহ তেলে-জলে নেয়ে—
হায়-হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে!
হায় হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে—
সুমুখে দুধের কড়া—কাটিতে ঘোটন,
খোলা চুলে চুলো জ্বেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন!
তপ্ত ভাতে ভরা হাঁড়ি, বেড়ি ধরে তোলা,
মদ্‌গুর মৎস্যের ঝোলে ধনে বাটা গোলা,
খাঁড়া বড়ি, শাক পাতালে বিলক্ষণ টান,
কালিয়ে-কাবাব রেঁধে দেমাকে অজ্ঞান!
শাঁখেতে পাড়িতে ফুঁক চূড়ান্ত নিপুণ,
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্মুখ খুন।
রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া গাড়ি মুদে যাওয়া,
দেশসুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া।
বাসরঘরে ঝুমুর-কবি চোখের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হলে পিসশাশুড়ি ঘোমটা মুখে চেয়ে।
সাবাস-সাবাস তোরে বাঙালির মেয়ে—
ব্রতকথা-উপকথা সেঁজুতি পালন,
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ!
মেয়ে-ছেলের বিয়ে পর্বে গাজনের গোল,
যাত্রা-সঙে নিদ্রাত্যাগ—ছেলে ভরা কোল,
ভূত-পেরেতে দিনে ভয়, অন্ধকারে কাঠ,
শক্তরোগে রোজা ডাকা, স্বস্ত্যয়ন পাঠ,
তীর্থস্থানে পা পড়িলে অহ্লাদে পুতুল,
হাটবাজারে লজ্জাহীন ঘরে কুঁড়িফুল।
গুঁড়িকাষ্ঠ নুড়িশিলা ভক্তিপথে নেয়ে!
হায়-হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে!
হায়-হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে!
রসের মরাল যেন জলটুকু ছেড়ে—

দুধটুকু টেনে নেন আগে গিয়ে তেড়ে ;
চীনের পুতুলে সাধ, বাক্‌সো টিনে পেটা!
র‍্যাফেল বাঁধা ছবিগুলা ঘরে-দোরে আঁটা।
খেলায় দিগ্‌গজ কেঁয়ে, চোরের সর্দার,
লুকোচুরি যমের বাড়ি—স্পষ্ট করে ঠার!
আয়েস খালি খোঁপা বাঁধা, নয় বিনুনো ঝারা
হদ্দ হল কচি ছেলে টেনে এনে মারা।
কার্পেটে কারচুপি কাজ, কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধিতে ডাল!
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে মুখসাপটে দড়,
হুজ্জুতে হারিলে কেঁদে পাড়া করে জড়ো,
বাঙালি মেয়ের গুণ কে ফুরাবে গেয়ে—
হায়-হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে!
হায়-হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে—
মৃদু-মৃদু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন,
সাবাস-সাবাস নাক-চোখের গড়ন ;
কালো চুলে কিবা ঘটা চোখে কালো তারা,
দেখে নাই যারা কভু, দেখে যাক তারা।
ভাসা-ভাসা খাসা চোখ তুলি দিয়ে আঁকা,
তা উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা।
থমকে-থমকে থির গতি কী সুন্দর,
হাসি-হাসি মুখখানি কিবা মনোহর!
আহা-আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে,
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখো চেয়ে—
হায়-হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে!

পরশ-মণি

(১)

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?
ওই যে অবনীতলে, পরশমানিক জ্বলে
বিধাতা-নির্মিত চারু মানব-চয়ন।
পরশমণির সনে, লৌহ-অঙ্গ পরশনে
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ-বচন—

এ মণি পরশে যায়　　　মানিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি,　　　মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি　　　আছে ধরা আলো করি,
মাটির অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ!

(২)

পরশ-মানিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর,　　　কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত।
কে রাখিত চিত্র করে　　　চাঁদের জ্যোৎস্না ধরে
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে?
কেবা এই সুশীতল　　　বিমল গঙ্গার জল
ভারত-ভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে?
কে দেখাত তরুকুল　　　নানা রঙ্গে নানা ফুল
মরাল-হরিণ-মৃগে পৃথিবী শোভিয়া?
ইন্দ্রধনু আলো তুলে　　　সাজায়ে বিহঙ্গকুলে
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া?

(৩)

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল　　　হয়েছে এ মহীতল
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী!
কী আছে ধরণী-অঙ্গে,　　　নয়ন-মণির সঙ্গে
না হয় মানব-চিত্তে আনন্দদায়িনী।
নদীজলে মীন খেলে,　　　বিটপীতে পাতা হেলে
চরেতে বালুকা ফুটে তৃণেতে হিমানী,
পক্ষিপাখা উড়ে যায়　　　পিপীলি শ্রেণীতে ধায়
কঙ্কারে তুষার পরে ঝিনুকে চিক্কনী!
তাতেও আনন্দ হয়—　　　অরণ্য কুজ্ঝটিময়
জ্বলন্ত বিদ্যুৎলতা তমিস্রা রজনী।

(৪)

ইহাই পরশমণি পৃথিবী-ভিতরে
ইহারি পরশবলে　　　সখা সখার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে,
শিখায়ে প্রেমের বেদ　　　ঘুচায় মনের ভেদ
প্রণয়-আহ্নিক করে সুখের সাগরে।
ধন্য এই ধরাতল,　　　প্রেম ভোগবতী-জল

পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে,
যুগল নক্ষত্রদুটি যে স্থানে বেড়ায় ছুটি,
সখারূপে মনসুখে পৃথিবী-উপরে।
কোন পুণ্যে হেন নিধি মানবে পায় রে বিধি—
গেল চলে চিরদিন অই আশা ধরে!

(৫)

অপূর্ব মানিক এই পরশ-কাঞ্চন!
স্নেহরূপ কত ফুল ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন
জননী-বদন-ইন্দু মরি কী করুণা-সিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশী-রশ্মি-মাখা চারু ইন্দিবর আঁকা
পুত্রের অধর-ওষ্ঠ নলিন আনন ;
সোদরের সুকোমল স্বসা-মুখ নিরমল
পবিত্র প্রণয়পাত্র হীরক কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার সফল জীবন। —
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?

জীবন-মরীচিকা

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে!
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!
প্রভাতে অরুণোদয় প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ ভূধর দেশ, ধরিয়ে অপূর্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজি আকারে।
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদুমৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আসি, করে স্নিগ্ধ আত্মারে।
"পৃথিবী ললামভূত নিত্য সুখে পরিপ্লুত"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত-মাঝারে।

ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়
মনে হয় সমুদয় সুধাময় সংসারে ॥
মধ্যাহ্নে তাহার পর প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ না থাকে কুসুম-গন্ধ,
না ডাকে বিহঙ্গকুল সমীরণ ঝংকারে।
সেইরূপ ক্রমে যত শৈশব-যৌবন গত
মনোমতো সাধ তত ভাঙে চিত্ত-বিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা লয়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহরে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মতো ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত এইরূপে হয় কত,
মর্তবাসি-মনোরথ, হাদগ্ধ বিধাত রে!
ধর্মনিষ্ঠাপরায়ণ, সুচারু পবিত্র মন,
বিমল স্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে।
অসত্য কলুষলেশ, বিঁধিলে শ্রবণদেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
বামাশক্তি বামাচার, শুনিলে শত ধিক্কার,
জ্বলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথা রে?
কোথা সে দয়ার্দ্র-চিত্ত সংকল্প যাহার নিত্য
পরদুঃখ বিমোচন এ দুরন্ত সংসারে?
অত্যাচার উৎপীড়ন করিবারে সংযমন,
না করিত যেইজন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ না জানিত তোষামোদ,
সে তেজস্বী মহোদয়-বাঞ্ছা এবে কোথা রে ॥
কত যুবা যৌবনেতে চড়ি আশা-বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভা রে।
তুলিবে কীর্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গলঘট,
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য
হয়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরা রে।
স্বদেশহিতৈষী কেহ, ভাবিয়ে অসীম স্নেহ,
কত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে ॥
করি চিত্তে অভিলাষ হয়ে সারদার দাস,
পিবে সুখে চিরদিন অমরতা-সুধা রে।

কালের করাল স্রোতে, ভাসে যবে জীবনেতে
এইসব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে।
কিশোর গাণ্ডীবধারী জামদগ্ন্য দৈত্যহারী,
ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কালীদাস কত ডোবে পাথারে।
কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনোমতো মালা,
সাজাইতে মনোমতো প্রিয়তম সখারে।
হৃদয় মার্জিত করে, আহা কত প্রেমভরে,
প্রিয়মূর্তি চিত্র করে রাখে চিত্ত-আগারে।
নববিবাহিত কত, পেয়ে পতি মনোমতো,
ভাবে জগতের সুখ ভরিয়া ভাণ্ডারে।
এইসব অবলার কিছুদিন পরে আর,
দেখো, মর্মভেদী শেল দেয় কত ব্যথা রে!
দেখো গে কেহ বা তার, হয়েছে পঞ্জরসার,
শুষ্ক হয়ে মাল্যদাম শূন্যে আছে গাঁথা রে।
মনোমতো নহে পতি মরমে-মরমে সতী,
উদ্‌যাপন করিয়াছে পতি-সুখ আশা রে।
কৃতান্তের আশীর্বাদে দিবা-নিশি কেহ কাঁদে,
বিষম বৈধব্য-দশা নিগড়েতে বাঁধা রে।
দারুণ অপত্যতাপে, দেখো হে কেহ বিলাপে
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদরে।
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
তাহলে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে।
কোথা গেল সে প্রণয় বাল্যকালে মধুময়,
যে-সখ্যতাপাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে।
সমপাঠী কেলিচর অভেদাত্মা হরিহর
এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে!
পতঙ্গপালের মতো কর্মক্ষেত্রে অবিরত,
স্বকার্যসাধনে রত কেবা ভাবে কাহারে!
আহা পুনঃ কতজন, করিয়াছে পলায়ন,
মর্তভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগন-নক্ষত্রবৎ তাহারাই অকস্মাৎ
প্রকাশে ক্বচিৎ কভু মৃদুরশ্মি মাখা রে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা-চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্র-শোভা নীলনভঃ-মাঝারে।
দিন-দিন কতবার জাগ্রত নিদ্রিতাকার,
স্বপ্নে-স্বপ্নে ভ্রমিতাম নদ হ্রদ-কান্তারে!
বসন্ত বরষাকালে পিকবর, মেঘজালে,
হেরিতে দামিনীলতা, কী আনন্দ আহা রে।

সে সাধ তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচালে জীবনের হেন রম্য ধাঁধাঁ রে!
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী সিংহাসন,
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধচিতা অঙ্গারে?

কোনো একটি পাখির প্রতি

(১)

ডাক রে আবার, পাখি, ডাক রে মধুর!
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান
অমৃতের ধারাসম পড়িছে প্রচুর।
বলিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসালমূলে
দেখিনু উপরে চেয়ে আশায় আতুর।
ডাক রে আবার ডাক্, সুমধুর সুর।

(২)

কোথায় লুকায়েছিল নিবিড় পাতায় ;
চকিত চঞ্চল আঁখি, না পাই দেখিতে পাখি
আবার শুনিতে পাই, সংগীত শুনায়।
মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল, এ সংগীত নিরমল?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায়?
ডাক রে, আবার ডাক, পরান জুড়ায়।

(৩)

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,
কখনো আদর করে, কভু অভিমান-ভরে,
অমনি ঝংকার করে লুকায়ে থাকিত।
কী জানিবি পাখি তুই, কত সে জানিত।
নব-অনুরাগে যবে, ডাকিত প্রাণবল্লভে,
কেড়ে নিত প্রাণ-মন, পাগল করিত ;
কী জানিবি পাখি তুই, কত সে জানিত!

(৪)

ধিক মোরে, ভাবি তারে আবার এখন!
ভুলিয়ে সে নব-রাগ, ভুলে গিয়ে প্রেমযাগ,

আমারে ফকির করে আছে সে যখন,
ধিক মোরে, ভাবি তারে আবার এখন!
ভুলিব-ভুলিব করি, তবু কি ভুলিতে পারি!
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন ;
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন?

(৫)

ডাক রে বিহগ তুই ডাক রে চতুর ;
ত্যজে শুধু সেই নাম, পূরা তোর মনস্কাম,
শিখেছিস আর যত বোল সুমধুর ;
ডাক রে আবার ডাক, মনোহর সুর!
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুসুমিত লতা,
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর ;
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর।

বন্দে মাতর্গঙ্গে

হরিপদ সংহৃতা, ত্রিলোক বিরাজিতা,
ধীর সমুন্নত বিবিধ তরঙ্গে,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু, জঠর বিঘাতিনী,
শূন্য বিহারিণী সহস্রভঙ্গে,
চন্দ্রশেখরশির—মৌলিবিলাসিনী,
কেলি কুতূহলা সুরবালা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

বহুবল ধারণ সুরেন্দ্রবারণ,
দর্পবিনাশন তব ভ্রূভঙ্গে,
শৈলনিবাসিনী, বহুভাষভাষিণী,
তুষারচর্চিত হিমাচলশৃঙ্গে,
নির্মল সলিলে ত্রিভুবন অখিলে,
পিতৃতর্পণ মাগো তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

স্বচ্ছ-তটশালিনী সু-অটবীমালিনী,
স্বর্গস্রোতস্বতি ক্ষিতিতল অঙ্গে,
শশাঙ্ককরহারা, শীতল শ্বেতধারা,
সাগরগামিনী বহুবিধ রঙ্গে,
সুরনর-অর্চিতা, অবনি-আবির্ভূতা,
ভারতভূষণ ভগবতি সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

বেদে প্রবাট নাম পুরাণে গুণগ্রাম
কত যুগ মাগো আরাধ্যা জগতে,
ঋক-সামন-ঋষি হর্ষ পীয়ুসে ভাসি,
স্তোত্র গাঁথিয়া তব ছন্দস্ গীতে,
বাল্মীকি ব্যাস পরে, ওই পদ ধ্যান করে,
কী মধুর গুঞ্জিত পদ-তরঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

তুই মা জাহ্নবি আর্যমহিমাচ্ছবি,
উজ্জ্বল উন্নত যত ইহ ভুবনে,
তোমারি নীরধারে যুগযুগান্তরে
হৈল প্রকাশিত ভারত জীবন,
রাজ্য বানিজ্য দেশ, দুর্গপুরি অশেষ,
অস্ত উদয় কত হেরিলে অপাঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

ধন্য ভাগীরথি পাতকিজনগতি,
দুস্কৃতিবারিণী তীর তরঙ্গে,
কিবা নিরুপমা তব ধৃতি ক্ষমা,
সমূহ ভারত পাপবর অঙ্গে,
আর্য ভুবনবাসী অন্তিমে তটে আসি,
অস্থি নিমজ্জয় তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

ধীরাজ মহীপাল ধনাঢ্য কী রাখাল
পশ্বাদি প্রাণীগণ অভেদ ও নীরে,
কী ঋষি ব্রাহ্মণ চোর কী দস্যুগণ,
নাহি নিবারণ একই প্রাণীরে,
সর্ব পাতকি দেহ অঙ্কে তুলিয়া লহ
দেহ মুক্তিদান কীটপতঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

মাতর্জাহ্নবি ওই তব পদ সেবি,
পূর্ব পিতৃ যত গত কালে-কালে,
বংশাবলী কত এখন হবে গত,
তব কোলে মাতঃ পূত সলিলে,
ভবজনতারণ পাপবিমোচন,
সমাধি স্থান হেন কোথা মহী অঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

গঙ্গে অঙ্গে তব, অন্তে কি স্থান পাব,
দেহ মিলাব মাগো, তব পুণ্য তোয়ে,
ভ্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদচ্ছায়া
তাপতপ্তকায়া ষড় রিপু রঙ্গে,
সর্বপাতকহরা, গঙ্গে রুদ্রশেখরা,
স্বর্গসরিদ্বরা লইও না সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

ফাল্গুন-চৈত্র, ১২৯৫ প্রচার।

রেলগাড়ি

এসো কে বেড়াতে যাবে—শীঘ্র করে সাজো।
ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ!
শীঘ্র উঠো—ত্বরা করি
বাক্‌সো, ব্যাগ, তল্পি ধরি ;
এখনি বাজিবে বাঁশি,
ঠং-ঠং-ঠং-কাঁসী
বাজিবে ইস্পাত-বোলে,
ছাড়িবে নিশান-দোলে,
শীঘ্র উঠো—পড়ে থাক ছড়ি, ঘড়ি তাজ ;—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!
ওই শুন টিকিটের ঘরে কিবা গোল—
মানুষের গাঁদি যেন—ঠেকাঠেকি কোল!
টকস টকস নাদে
বাবুর টিকিট ছাঁদে,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে ছোটে,
শাড়ি, ধুতি, হ্যাট, কোটে
ঠেকাঠেকি—ছুটে যায়
কেহ কারে না সুধায়,
গেলো গেলো মুখে বোল,
আয়, নে রে, খোল, তোল
হেরো চলে কানাকানি
কিবা লাট, রাজা, রানী!
ওই ফুকারিল বাঁশি,
ঠং-ঠং শেষ কাঁসি,
গাড়িতে পড়িল চাবি—আর নাহি গোল,
দুলিল সবুজ-রঙা পতাকার দোল।

চলিল পুষ্পকরথ ফু-কারে ফু-কারে,
এখন নিশ্বাস ছাড়ি দেখো হে দু-ধারে—
হরিত বরণ মাঠ,
ধান্য, নীল, ইক্ষু, পাট,
আকাশ ঢেকেছে যেথা
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা!
দেখো হে দু-ধারে চেয়ে
পশ্চাতে চলিছে ধেয়ে

সারি সারি নারিকেল,
তাল, বট, আম, বেল,
জাঙাল, পগার, বাঁধ,
বেড়, বাড়ি, নানা ছাদ,
সৌদামিনী-বাঁধা হার
ছুটেছে তামার তার,
উড়িয়া চলেছে রথ
বেগেতে কাঁপিয়ে পথ—
পক্ষী মৃগ দূরে পড়ি মানিতেছে লাজ—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।

চলুক চলুক রথ—যে যার ভাবনা
ভাবো বসে নিরুদ্বেগে ছুটায়ে কল্পনা ;
স্বভাবের প্রিয় যারা
হেরো গিরি বারিধারা,
নিবিড় ভূধর গায়
হেরো খেলা কুয়াসায়,
নিশিতে ক্ষেত্র পাঁতি
হেরো চন্দ্রমার ভাতি,
দেখো হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ানো মাথায়—
দেখো দিগন্তের কোলে কী শোভা খেলায়।
হেরো হেরো তীর্থ মনে চলেছে যাহারা
পথের দু-ধারে তীর্থ—শীঘ্র নামো তারা,
গেলো চলে—গেলো রথ,
ওই বৈদ্যনাথ পথ,
গুছাতে সবে না দেরি,
কাজ নাই সঙ্গী হেরি,
দেখিতে দেখিতে যাবে
সীতাকুণ্ড আগে পাবে,
কিছুদূর আগে তার
বাঁকিপুর গয়া দ্বার,
দণ্ড কত যাক যান
পাবে কাশীতীর্থ স্থান,
প্রয়াগ, অযোধ্যা ছাড়ি পাবে অগ্রবন—
মথুরা তাহার পরে হেরো বৃন্দাবন!
মানব জনম, হায়, সার্থক হে আজ—
সাবাস বাষ্পীয় রথ—সাবাস ইংরাজ!

আরো দূরে যাবে যারা
শীঘ্র রথে উঠো তারা
হরিদ্বার, গঙ্গাঝরি,
পুষ্কর, দ্বারকাপুরী,
নর্ম্মদা, কাবেরী নদ,
ইলোরা বৌদ্ধ-গহ্বর,
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর,
ভ্রমিব নক্ষত্র-গতি,
পর্বত শৃঙ্গেতে পথি
হেরিবে বিমানে চড়ি—ত্রেতায় যেমন
সীতারামে ইন্দ্ররথে সিন্ধু-দরশন।

এসো হে কে যাবে, চলো ভারত-ভ্রমণে
দুয়ারে পুষ্পক রথ ছাড়িছে নিস্বনে!—
আর কেন বঙ্গবাসী
পায়ে বেঁধে রাখো ফাঁসি,--
বাঙালির যে দুর্নাম
ঘুচায়ে, সাধ হে কাম,
আর যেন স্ত্রৈণ বলে
বাঙালিরে নাহি বলে,
এবে পরিষ্কার পথ.
যাও যথা মনোরথ,
বোম্বাই কিম্বা কলিঙ্গ
শিলং দুর্জয়লিঙ্গ,
সিমলা পাহাড় পাট,
কাশ্মীর, মারহাট্টাঘাট,
যেখানে করে, গমন,
সাধিতে পার হে পণ
পুষ্পক বিমানে চড়ে সেইখানে যাও—
বাঙালির লজ্জাকর দুর্নাম ঘুচাও!
ভারত-ভ্রমণে চলো শীঘ্র করো সাজ
দুয়ারে পুষ্কক রথ বেঁধেছে ইংরাজ!
ধন্য রে বিমান ধন্য!
ধন্য হে ইংরাজ ধন্য!—
কলে জিনিয়াছে কাল,
অঙ্গারে জ্বালায়ে জ্বাল,
বহ্নিরে বেঁধেছ রথে,

পবনের মনোরথে
তুচ্ছ করি, করো খেলা
কি নিশি মধ্যাহ্ন বেলা,
বেঁধেছ ভারত অঙ্গ
লৌহ জালে, করি রঙ্গ,
অসুর অসাধ্য কাজ সাধিতেছে জগতে!-
জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,
পার না কি বাঁচাইতে নির্জীব ভারতে?

খিদিরপুর দাঁতভাঙা কাব্য

বাঙালিরা তবে শুন বাঙালির যত গুণ
ব্যাখ্যা করি আজ্ঞা মতো তাঁর ;
সত্য প্রিয় ধরাধামে অমৃতবাজার নামে
সুবিখ্যাত পত্রিকা যাঁহার।
বাঙালির মুখ-পাত বাঙালির বিষ দাঁত
বাঙালির চক্ষু মুখ নাক ;
বাক্যবিশারদ বীর প্রিয় পুত্র-জননীর
অন্ধকার বঙ্গের জনাক—
আমার শিশির ভাই তাঁহার আদেশে গাই
ইথে কেহ নাহি কর ক্রোধ ;
আচার্য যেমন যার সেইরূপ শিষ্য তার
অধমের এই অনুরোধ ॥

১

বাঙালির অপূর্ব জাতি বিষম যুযেন্দ্র ছাতি
সাহসে সম্বাদ পত্র লেখে ;
মল্লভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয়
কল্পনায় কত যুদ্ধ দেখে।
বিড়ালে করিলে তাড়া মুষা যদি দেয় সাড়া
অমনি লেখনী ধরে বীর!
সাত সর্গে উপাখ্যান সাঙ্গ করি তেজীয়ান্
বঙ্গভূমি করয়ে অস্থির।
ঘরে যদি শিশু কাঁদে সম্পাদক ঘোর নাদে
ছুটে গিয়া কার্নিসে দাঁড়ায়।

বগলে কাগজ আঁটি কলম ঢাকের কাটি
বর্গী এলো বলিয়া চেঁচায়।
অমনি বাঙালি যত উচ্চ শব্দ করে কত
মাথা তুলে উঠিয়া দাঁড়ায় ;
পলাশি পাদুকা ভুলে উঠানে পতাকা তুলে
ভারত উদ্ধার করে হায়।
এই গেল এক ঝাড় পালোয়ান গোঁপে চাড়
দিয়া রঙ্গে মল্লবেশে সাজি ;
কলমে বাজায় ডঙ্কা কুঁদনিতে জিনে লঙ্কা
কথায় দেখায় ভেল্কিবাজি।

২

দ্বিতীয় বাহন দল ইঁহাদের যে সকল
বাঙালির গৌরবের হাঁড়ি
কথায় পাথর কাটে কোঁচা করে মাল সাটে
দাপটে-সাপটে আসে বাড়ি ;
গিন্নি ঘরে কান্না করে আসি মন্দ রাগভরে
সে দিনের পত্রিকা ছড়ায়,
যত পড়ে গাত্র জ্বলে স্ত্রীর অঞ্চল তলে
ডুকুরিয়া কতই ফোঁপায়।
পত্রিকার বাক্যবাণ তাতে পুরুষের প্রাণ
অপমান সহিতে কি পারে?
গালে মুখে মারে চড় সমুৎসাহে ধড়-ফড়
শেষে দুঃখে যায় গোঁসাগারে।
গৃহিণী ভাতের থালা এনে দিলে দেহজ্বালা
তখনি সে হয় নিবারণ ;
আবার সকালে উঠে হাঁপায়ে আফিসে ছুটে
ফুলিস্কেপ করিতে পেষণ।
গায়ে থাকে গা-র ঝাল আবার সপ্তাহ কাল
গত হলে গায়ের দাহন ;
ভাগ্যবলে বাঙলার করিতে ভারত উদ্ধার
এই সে দ্বিতীয় প্রকরণ।

৩

তৃতীয় তাহার পর সেই সব গুণধর
এই অন্ধ বাঙলার নড়ি ;
শোনা কথা সাত কান করে যারা খান-খান
খেলে খালি লৈয়ে কানা কড়ি।

ঝাপট সাপট সার নাহি ছাড়ে গৃহদ্বার
তিল পেলে করো তোলে তাল ;
কপাটে হুড়কা এঁটে লাঠি ধরে কসি সেঁটে
আগে যেতে হাঁটে পিছুয়াল ;
বিদ্যার ঘরেতে ফক্কা বিছানায় হেরে মক্কা
টিমটিমিয়ে ঢক্কা ভান করে ;
বায়স ডাকিলে তায় ভাবে সে গরুড় ছায়
কেঁচো দেখে দশ হাত সরে।
ইংরাজির ভাঙা বুলি জিহ্বা অগ্রে কতগুলি
সর্বদাই করে ধড়্-ফড়্ ;
লড়ায়ের কথা কত ঝড় বহে অবিরত
শেষ কথা ক্যাম্প ছাড়ি রড়!
উঠেছে ছাপার ছত্রে অমৃতবাজার পত্রে
বাঙালির গুণের কীর্তন।
বাহ্‌ওবা দেয় সাতবার হাত পা আছাড়ে আর
ঘরে গিয়া করয়ে শয়ন।
ভারত উদ্ধার হেতু ইংরেজি বিদ্যার সেতু
এই সে তৃতীয় প্রকরণ ॥

৪

চতুর্থ আমার মতো ঝোল ভাত রাঢ়ী যত
ধীর শান্ত স্থির সহিয়ান্,
বনেদি প্রথায় চলে শক্ত দেখে বাপু বলে
কিল চড়ে নাহি যায় মান,
চাপট পড়য়ে যেই গাল ফিরাইয়া দেই
দুর্বল মানিতে নাহি লাজ ;
চটকের প্রাণ লৈয়ে সুবৃহৎ গাছ বৈয়ে
সাধ করে না হইতে বাজ !
দিব্য চক্ষে দৃষ্টি হয় এখন তো সে দিন নয়
দাঁত ভাঙে গৌরাঙ্গের কিলে!
এখনো সে বিবিজান অন্দর ছাড়ি পালান
দূরে দেখি ফিরিঙ্গীর ছেলে!!
বদনে রদন নাই আর কি বলিব ভাই
তবু বাণী শুন খোগ্‌লার
বাঙালির ফণা ধরা মরিতে পালক পরা
ছাতারের নৃত্য করা সার ॥

খোগ্‌লাচন্দ বন্দীয়ান

অমৃতবাজার পত্রিকা, ২ জুলাই ১৮৭৪ [দ্র : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫২]

হুতোম প্যাঁচার গান

আসর বর্ণন

এসো এসো সবার আগে ঠাকুর বাড়ির চাঁই,
বুল্‌বুলি পাগ শিরে বাঁধা তালপাতা সেপাই।
পাথরঘাটায় রাজগীজারি "সার" মহারাজ নাম,
মুন্সী-আনায় জেঁকে গেছে ছ্যাতলা ধরা থাম।
সিঁতির মাঠে কুঞ্জবিহার দীপ্ত মরকত,
কুঞ্জ-মাঝে 'প্রটো' গন্থুর মাটিতে পর্বত।
বংশ যশে 'লেজিসলেটিভ' রংমহলে চড়ে
রাজ-মহারাজ নাগরা পিটে মাথায় পগ্‌গ নেড়ে।
মিষ্টি বোলে মিছরি ঘোঁটা সবটুকু সে ছাঁকা ;
(যার) অভ্যুদয়ের ছায়া লেগে শহরখানা ঢাকা।
এসো এসো ভারত মাজী কসে ধরো হাল,
বিলিতি বাতাসে ভ্যালা উড়ায়েছে পাল।

এসো এসো দাদার পরে গলায় পরে হার,
অদ্বিতীয় ধরা মাঝে 'মিউজিক ডাক্তার'।
'অর্ডার অফ সি আই ই, অ্যান্ড রাজা-কম' ;
'অর্ডার অফ লিওপোল্ড কিংডম বেলজিয়ম',
'অর্ডার অফ ফ্রান্সে জোসেফ এম্পাইয়ার অস্ট্রিয়া',
'অর্ডার অফ ডলার ব্রোগ' ডেনমার্ক নিয়া,
'অর্ডার অফ অ্যালবার্ট অ্যান্ড স্যাক্‌শনী,
'অর্ডার অফ মেলুসাইন মেরি লুসিগনানী',
'অর্ডার অফ মলটা রোডস্ ফ্রাঙ্ক সিভেলার',
'অর্ডার ডিউ টেম্পেল ডিউ সেন্টসেপলকার',
'ইম্পিরিয়েল অর্ডার অফ পাউসিং চাইনার',
'সেকোনা কেলাস ইম্পিরিয়েল লাইনয় অ্যান্ড সন্দ,'
সেকেন কেলাস ইম্পিরিয়েল মেহেদিজি সুলতান',
'অর্ডার অফ্ গুর্খা তারা দিয়েছে নেপাল,
'শ্যামদেশের বসবামালা' পারস্য সা-জাদা,
এর ওপরে আরো কত এট্‌সেটেরার গাদা।
সত্যই এ সকলগুলি রাজশ্রীর হার,
সাক্ষী দেখো সব কেতাবের মলাটে বিস্তার।
(এখন) সরো সরো ছোট বড় রাজা মহাশয়,
আসর নিতে 'আউআর কজিন' হচ্চেন উদয়।

এসো এসো দেব অংশ এসো শীঘ্র করে,
তুমি না আসিলে শোভা হয় কি আসরে?

স্বয়ংসিদ্ধ মহারাজা শহর শোভন,
যথা গিরি গোবর্ধন গোকুলের ধন।
তোমার তুলনা দেব তুমিই আপনি,
গঙ্গার উপমা আহা গঙ্গাই যেমনি।
সভাস্থলে টাউনহলে বক্তৃতার চোটে,
ভাদুরে নদীর জলে ফেনা যেন ফোটে।
সেকেলে কেষ্টের মতো ধড়া পরা ঠিক,
খালি সে চুড়োটি নাই তিলক কৌলিক।
মাথার চুলের ভাঁজে খেলে জোয়ার-ভাঁটা,
সমুখে বাগানো ভেড়ি ঘাড়ে দেখি ছাঁটা।
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাই,
কাশী-মক্কা পাশাপাশি কোন্ দিকে তাকাই।
এসো এসো মহারাজ আরো ঘেঁসে যাও ;
আতর-গোলাপ পাস্ লে-আও লে-আও।

এসো তো বণিকপতি এসো তো এবার,
কর তো জাঁকায়ে বসে আসর গুলজার।
নেটিবের সদাগর বেনেদের নাক,
কমলার কলকাটি সোনার মৌচাক।
দেশকুল-মুখোজ্জ্বল ব্যাপারে হুনুরি,
বাজারে যাহার হালে বড়ই জাহিরি।
বড় 'লকী' জাদুগীর দাঁত বাঁধা 'চ্যাপ'
হানা-বাড়ি হাতে নিলে হয় সোনাচাঁপ।
এর কাছে আর যত ঝুটো পোখরাজ,
গিল্‌টি-সোনা দাগি চুনি ঝকে মারে লাজ।
শহরে সবার কাছে শুনি এর নাম,
আকবরী আসরফী যেন দরে দুনো দাম।
অল্পভাষী 'নোভো হোমো' কাঁচামিঠে ঝাঁপ
গরমে পচেনি আজো টাটকা আছে মাজ।
তারি মতো ছোট ভাই গায়ে নাহি তাৎ,
শাবাস ত্রিমূর্ত লাহা কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ!

তারপর গুড়ি-গুড়ি এসে বুড়ো শিব,
গঙ্গার ওপারে বাড়ি অদ্ভুত 'নসীব'।
জমিদারি মিন্টে ঢালা আদ্যোৎ 'মডেল',
বাঙলার কাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল।
বয়েসে অনাদি-লিঙ্গ 'জরাসিন্ধ' বলে,
দাপটে এখনো যার হুগলি জেলা টলে।

মাল্ আইনে তোদের মল রোখে হাইদর আলি,
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলি।
গুষ্টি বহু, বাস্তুভূমি যেন লঙ্কাপুরী,
ইন্দ্রজিৎ-সম পুত্র কৌশলে মুহুরি।
দিগ্বিজয়ী দণ্ডধর রাষ্ট্রজুড়ে নাম,
ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ চরণে প্রণাম।

এই তো গেল কল্‌কাতা তোর কঙ্কাপরার দল,
দেখবো এবার গোটাকত দিকপাল আসল।
দেখবো এবার আসর মাঝে মনের রাজা যারা,
সব আসরে যাঁদের শিরে জ্বলে সোনার তারা।
তফাৎ সরো তফাৎ সরো ফড়িং-ফিঙের পাল,
আসর নিতে আসছে এবে বাজপাখি 'রয়াল'।

আসছে দেখো সবার আগে, বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যের সাগর খ্যাতি জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাপী
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞানবাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দাঢ্যে শালকড়ি
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে শেকুল-কাঁটা পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস্,
টোল-স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্।
এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ-অলঙ্কার।
দিকপাল তোমার মতো দেশে নাই আর।
দেখাও দেখি সাহেব-চাটা শহরে রাজায়
কার শোভাতে জলুস বেশি আসর জুড়ে যায়।

কার শোভাতে জলুস বেশি আসর জুড়ে যায়।
পাঁও লাগে বাচস্পতি এসো তো সভায়।
জীবন্ত ভাণর কোষ পাষানির মই
শাস্ত্রেতে সুপক্ক রুই নহে টুলো কই।
স্মৃতি দরশনে দৃষ্টি তর্কের মার্জার
মোক্ষমূলর-ল্যাসেনের মুগুর টোপর।
ব্যাকরণে ব্যোপদেব ভ্রাতর মামাতো
সংস্কৃত-বিদ্যা দাঁড়ে হরবোলা কাকাতো
শিক্ষাধারী খর্বদেহ দর্শনে দুর্বাসা

আলাপে তালের শাঁস কিম্বা শশা খাসা।
পাতা পেতে ছানা-ক্ষীর দিতে সাধ যায়
এসো এসো বাচস্পতি পাঁও লাগে পায়।
অনেকে তো নৈবিদ্যির ভাগ সরাতে জড়।
বলো তো জলুস কার সভার মাঝে বড়?

বলো তো সভার শোভা এবার কেমন
নমস্কার নমস্কার ন্যায়ের রতন।
ফুটেছ ব্রাহ্মণকুলে আপনার বাসে,
বুকেতে বেঁধেছ 'চাপ' প্রকৃতির 'পাসে'।
থানের চাদর পরা থানধুতি মোটা
কালোমুখে জ্বলে আলো প্রতিভার ছটা।
নিজগুণে নিজপণে রাঢ়ে বঙ্গে মান
পৈতৃক মকরধ্বজে নহ অনুপান।
সাহেব করেছ বশ বিদ্যারসে তাজা
বাসে তব ভাসে কত ফেদার-ধারী রাজা।
স্বভাবে মিঠেন প্রাণ মিঠেন বচন
গুমোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জন।
মুখে মিঠে বুকে কটু নহ নিন্দাভাষী।
উপদেশে পরজনে প্রকৃত বিশ্বাসী।
মজলিসেতে বাবুর পোশাক ঐটি কেলেঙ্কার
তবু হ্যাদে খাঁটি বাসে তুল্য কে তোমার?

এসো এসো তাহার পরে রেভারেন্ড সাজ
বন্দ্যকুল চূড়ামণি মানোআরি জাহাজ।
শুভ্রভুরু শুভ্রকেশ শুভ্রদাড়ি-চেরা
গিরীক-ল্যাটিন-হিব্রু-ইংরিজি ফোয়ারা।
মাকাল বনের মাঝে পাকা আম্রফল
স্বধর্ম তেয়াগী তবু স্বজাতির দল।
মিষ্টভাষী বঙ্গষষ্ঠী হৃদে মাখা চিনি
বয়েস খুঁজিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি।
দ্বাপুরে ভুষুণ্ডী বুড়ো সবেতে মহৎ
বাঙালির মাঝে যেন ধবলা পর্বত।
রাংতা-জরি চাকতি মারা নকিব ফুকার
বলো তো এমন আলো তোমাদের কার?

পথ ছাড়ো পথ ছাড়ো আসিছে এবার
গদাধর পাদপদ্মে মতি-গতি যার।

তালপত্র তাম্রপত্র পুথিপত্র থোকা
বগলে পুঁটলি বাঁধা কেতাবের পোকা।
এসো মিত্র লালে লাল মজলিস জাঁকাও
কেদারা ঠেসান দিয়ে মোড়াসা হেলাও।
প্রত্নতত্ত্ব তল্লাশিতে দিগ্‌গজ মসনদ
খড়ি মাড় নাই খাপে—আধোয়া গরদ।
আচার আমের সত্ত্ব কুলকুটো ভাঁজ
যখন যেদিকে হাত তাতে ধড়িবাজ।
বাক্‌যুদ্ধে বাগ্মিতায় লেখার লড়ায়ে
রাজনীতি রচনায় সুর বাজখেঁয়ে।
ইংরিজি বিদ্যা বাগানে ফার্স্টরেট মালি
ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যায় ডালি।
সকল বিদ্যার খই বুদ্ধি ভাজা খোলা
বিধি বিড়ম্বনে আজ কানে গোঁজা শোলা।
অহংত্ব বড় বেশি নহিলে হাজার
রাজার মাথার চুড়ো তুল্য কে উহার?

আসর জাঁকায়ে বসো তুমি অতঃপর
গালজোড়া ফ্যাসা গোঁপ বুড়ো প্যাগম্বর।
চুচুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান
হৃদয় ক্ষীরের খনি আকারে পাঠান।
হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা জ্ঞানগুড়ে
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
ইংরেজি শিক্ষার ফুল বাঙালি শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চে শিখরের চুড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাত,
শিক্ষাব্রত সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।
বচন বটের ফল ধীরে-ধীরে পড়ে
দেশের দোছোট বটে।—মোদ্দা কথা গড়ে
ধনে-মানে কুলে-যশে পদে পাকা তাল
সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল।
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ
দেখো হে পুতুল রাজা বাঙালির বাঘ।

তুমিও আসরে এসো বসো একবার
কলিতে কাঁসারিকুলে প্রভা জ্বলে যার।
কণ্ঠে তুলসির মালা দীনহীন বেশ
কাঁধেতে চাদর ফেলা পোশাকের শেষ।

শহরের দীন দুঃখী দরিদ্র অনাথ
আনন্দে দু-হাত তোলে যখনি সাক্ষাৎ।
চাহিয়া তোমার দিকে তাকায় আকাশ
শিশুর চক্ষুর ধারা মুছে চীরবাসে।
ভয় নাই এসো তুমি আছে অধিকার
বসিতে এদের পাশে 'ছাড়' বিধাতার,
কি হবে কোমর-পেটি কে চায় চাপরাস।
অনাথ তারক নামে পেয়েছো যে 'পাশ'
তরে যাবে তারি গুণে সকল দুয়ার।

আসর বর্ণনা আজ স্টপ আমার।
বড় বড় বুড়ো বুড়ো চুনে নিনু কটা
ফিরে আবার আসর নেবো মাথায় বেঁধে ফ্যাটা ॥
গাইব তখন আবার শুনো গুণটা যেমন যার
আল্লা গৌর বলো এখন বেলা দুপুর পার।
শ্রীপাঠ কলকাতা তত্ত্বে অধ্যায় প্রথম
হুতোম প্যাঁচার গান নরম-গরম॥

নবজীবন, আশ্বিন ১২৯১ [দ্র : মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৩০]

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ১৭ এপ্রিল (৬ বৈশাখ ১২৪৫) হুগলি জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাটে মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর গৃহে হেমচন্দ্রের জন্ম। পিতা: কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা : আনন্দময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়।

শৈশব : শৈশব কেটেছে রাজবল্লভহাটে। মাতামহের 'আদরে লালিত আদরে পালিত'—পল্লীগ্রামের মুক্ত আলো-বাতাসে 'বাল্য-ক্রীড়ার আহ্লাদে' কেটেছে সেই দিনগুলি। গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ। পরে ন'বছর বয়সে কলকাতায় খিদিরপুরে আসার পর সেখানেও কিছুদিন স্থানীয় পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। শৈশবে তিনি শান্ত ও ধীরপ্রকৃতি এবং পাঠে মনোযোগী ছিলেন। শেষজীবনে 'কি সুখের দিন' কবিতায় কবি শৈশবস্মৃতি-চারণা করেছেন— 'সেকালের প্রথা রামায়ণ গান/অপরাহ্ণে শুনি মোহিত হয়ে,/সমুদ্র-লঙ্ঘন পুষ্পকে গমন,/শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে-ভয়ে।/নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান/সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,/শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,/হৃদয়-ফলকে লিখিয়া রাখি।'

শিক্ষা : প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর কাছে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। পরে ১৮৫৩ সালে হিন্দু-কলেজে সিনিয়র-স্কুল-বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৫৫ সালে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৭ সালে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তন করলে হেমচন্দ্র সে-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৯ সালে কলেজে চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়ে পড়া ছেড়ে তাঁকে চাকরি গ্রহণ করতে হয়। তবে চাকরি করা সত্ত্বেও সেই বছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষা দেন, এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তিনজন ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইন-পরীক্ষা দেন এবং এল.এল উপাধি লাভ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে এল.এল. পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র যাঁরা গ্রাজুয়েট, তাঁরা তিরিশ টাকা ফি দিয়ে বি.এল. উপাধি লাভ করেন (১৮৬৬)।

বিবাহ : সেকালে প্রচলিত প্রথানুসারে কৈশোরে ছাত্রাবস্থায় (১৮৫৪?) হেমচন্দ্রের বিবাহ হয়। পত্নী কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কামিনী দেবী। শোনা যায় কামিনী দেবী কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। ১৮৯৩ সালে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি

ও অন্যান্য অসুখ দেখা দেয়। ফলে কবি 'শেষ জীবনে অবিমিশ্র দাম্পত্য-সুখলাভে বঞ্চিত' ছিলেন।

কর্ম : বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার অল্প আগে মিলিটারি অডিটর-জেনারেলের অফিসে কেরানির চাকরি গ্রহণ করেন। পরে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলে হেডমাস্টার হন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কিছুদিন মুন্সেফের কাজ করেন (১৮৬২)। তারপর হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং ব্যবহারজীবী হিসেবে দ্রুত সাফল্য অর্জন করেন। ১৮৯০ সালে তিনি হাইকোর্টের প্রধান সরকারি উকিল নিযুক্ত হন।

গ্রন্থ : চিন্তাতরঙ্গিণী : ১৮৬১; নিদর্শন-তত্ত্ব [গদ্য অনুবাদ] : ১৮৬২; বীরবাহু কাব্য : ১৮৬৪; নলিনী-বসন্ত নাটক [শেকসপিয়রের টেম্পেস্ট নাটক অবলম্বনে] : ১৮৬৮; কবিতাবলী : ১৮৭০; বৃত্রসংহার কাব্য (প্রথম খণ্ড) : ১৮৭৫; ভারতভিক্ষা : ১৮৭৫; আশাকানন : ১৮৭৬; বৃত্রসংহার (দ্বিতীয় খণ্ড) : ১৮৭৭; কবিতাবলী, (দ্বিতীয় খণ্ড) : ১৮৮০; ছায়াময়ী [দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া অবলম্বনে] : ১৮৮০; দশমহাবিদ্যা : ১৮৮২; হুতোম প্যাঁচার গান : ১৮৮৪; নাকে খৎ : ১৮৮৫; ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব : ১৮৮৭; রোমিও-জুলিয়েত [শেকসপিয়রের নাটক অবলম্বনে] : ১৮৯৫। চিত্ত-বিকাশ : ১৮৯৮।

মৃত্যু : হেমচন্দ্র শেষ-জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) শোক-দুঃখ-ব্যাধি এবং দারিদ্র্য-পীড়িত কবির খিদিরপুর বাসগৃহে মৃত্যু হয়।